বিএসআরআই পরিচিতি

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরদী, পাবনা

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

পরিচিতি

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরদী-৬৬২০, পাবনা, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিচিতি
(Introducing to Bangladesh Sugarcrop Research Institute)

সম্পাদনায় ঃ
ড. কবির উদ্দিন আহমেদ

রচনায় ঃ
বিএসআরআই এর সকল গবেষণা বিভাগ
আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রসমূহ

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরদী-৬৬২০, পাবনা

প্রচ্ছদ ঃ কাজী শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যাশা

প্রকাশনা নম্বর ঃ ৮৬
প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ খ্রি.

প্রথম সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রি.

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ইতিহাস	৫
কার্যাবলী	৮
অবকাঠামো	১০
বিএসআরআই বোর্ড	১১
কার্যসম্পাদন	১২
বিএসআরআই এর পরিচালকের দপ্তর, গবেষণা বিভাগ, আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রসমূহের কার্যপরিধি	১৩
গবেষণা কর্মসূচি পরিকল্পনা, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন	২৬
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র	২৮
উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম	২৮
গবেষণায় অর্জিত সাফল্য	২৯
জাতীয় অর্থনীতিতে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবদান	৪০
সম্মাননা ও পুরস্কার	৪০
গবেষণার নতুন কৌশল	৪১
ম্যান্ডেট অনুযায়ী ফসলের বিবরণ	৪৪

বাংলাদেশের মানচিত্রে সুগারক্রপ গবেষণার নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ দেশের একটি প্রাচীন ও অগ্রজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে ইক্ষু, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া এবং মধুসহ মিষ্টিজাতীয় ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা করা হয়। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস-চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প গড়ে উঠেছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) মতে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বছরে ১৩ কেজি চিনি বা ১৭ কেজি গুড় খাওয়া দরকার। সেই হিসাবে ২০৩০ সালে প্রাক্কলিত ১৮ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের জন্য দেশে চিনি ও গুড়ের প্রয়োজন হবে প্রায় ২৩.৯২ লক্ষ টন। বর্তমানে দেশে ৯টি চিনিকল চালু থাকায় প্রায় ৫০-৬০ হাজার হেক্টর জমিতে ইক্ষুচাষ হয় এবং এ থেকে প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষ টন ইক্ষু উৎপাদিত হয়। পর্যায়ক্রমে ৬টি চিনিকলগুলো পুনরায় চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে সে প্রেক্ষিতে ইক্ষু উৎপাদনের প্রায় ৬০ হাজার থেকে ১ লক্ষ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে এবং এ থেকে প্রায় ৬০-৬৫ হাজার মেট্রিকটন চিনি উৎপাদিত হবে। ইক্ষুর হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া কাঙ্খিত পরিমাণ চিনি/গুড় উৎপাদন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য বহুমুখী গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন আবশ্যক।

বিএসআরআই তার সীমিত জনবল ও সম্পদ নিয়েই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত এ ইনস্টিটিউট থেকে দু'ধরণের কাজ সম্পাদিত হয়: (ক) ইক্ষু ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উন্নত জাত ও উৎপাদন কলা-কৌশল উদ্ভাবন এবং (খ) মিষ্টিজাতীয় ফসলের উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও উৎপাদন কলাকৌশলসমূহ চাষীদের মধ্যে বিস্তার ঘটানো। নয়টি গবেষণা বিভাগ, একটি সংগনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দু'টি গবেষণা বিভাগ, নয়টি উপকেন্দ্র এবং একটি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং সাধারণত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তিসমূহ চাষী পর্যায়ে উপযোগিতা যাচাই করে, মিষ্টি জাতীয় ফসল চাষী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়, চাষীর জমিতে নতুন প্রযুক্তি সমূহের প্রদর্শনী স্থাপন করে, বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের বিস্তারণ ঘটায় এবং এর ফিড-ব্যাক তথ্য সংগ্রহ করে।

ইতিহাস

ভারতের কোয়েম্বাটরে ১৯১২ সালে 'ইক্ষু প্রজনন কেন্দ্র' স্থাপনের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল এ উপমহাদেশে প্রথম ইক্ষু গবেষণা কার্যক্রম আর বাংলাদেশে তা শুরু হয়েছিল ১৯৩১ সালে ঢাকার মনিপুরী ফার্মে। বিএসআরআই এর সেই ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল:

ইক্ষুচারা পরীক্ষাগার (১৯৩১-১৯৪৭): কোয়েম্বাটর এর ইক্ষু প্রজনন কেন্দ্র থেকে ইক্ষুর প্রকৃত বীজ (fuzz) সংগ্রহ করে এ এলাকার উপযোগী উন্নত জাত বাছাই করার জন্য ১৯৩১ সালে Seedling Testing Laboratory বা ইক্ষুচারা পরীক্ষাগার মণিপুরী ফার্মে স্থাপিত হয়। তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের Royal Imperial Council of Agriculture এর

অর্থানুকূল্যে এ পরীক্ষাগারটি পরিচালিত হতো এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তা কার্যকর ছিল। এ পরীক্ষাগার থেকে বাছাইকৃত ইক্ষুজাত যেমন Co ৫২৭ আজও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষাবাদ হচ্ছে।

ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র (১৯৫১-১৯৭১): ১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে মাত্র ১৭ জন জনবল নিয়ে 'ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপন করেন। তখন কেন্দ্রটির কার্যক্রম শুধুমাত্র ইক্ষু প্রজনন এবং জাত বাছাই এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ কেন্দ্র থেকে নয়টি ইক্ষুজাত উদ্ভাবন করা হয়, যার মধ্যে ঈশ্বরদী ১/৫৩ এবং ঈশ্বরদী ২/৫৪ দেশের বিভিন্ন স্থানে এখনও চাষাবাদ হচ্ছে। ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রের অধিকতর উন্নয়নকল্পে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের 'খাদ্য ও কৃষি কাউন্সিল' কেন্দ্রটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি ছাড়াই ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রটিকে পুনরায় প্রাদেশিক সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ দেয়। ফলে জনবল ও গবেষণার সীমিত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে এ কেন্দ্রটি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।

ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৯৭১-১৯৭৯): দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রটিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন তৎকালীন বাংলাদেশ চিনিকল সংস্থার (বর্তমান বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা) নিকট হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ চিনিকল সংস্থা ১৯৭৪ সালে 'ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট' নামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে যা ঠাকুরগাঁওস্থ আঞ্চলিক কেন্দ্রসহ একনেক (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১৯৮০-১৯৮৮): দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা ঈশ্বরদী ও ঠাকুরগাঁও-এ 'স্টাফ ট্রেনিং সেন্টার' স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে একটি প্রকল্প পেশ করে। প্রকল্পটি বিবেচনাকালে প্রস্তাবিত স্টাফ ট্রেনিং সেন্টারকে ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে যুক্ত করে অনুমোদন দেওয়া হয় এবং ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন করে 'ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' করা হয়।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৯৮৯): বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯ সালে একটি ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে এবং সমগ্র দেশব্যাপী ইক্ষু গবেষণার পাশাপাশি খেজুর, তালসহ অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় ফসলের উপর গবেষণার দায়িত্বও অর্পণ করে। ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশ বলে ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে বিলুপ্ত করে 'বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট' নামকরণ করা হয় (অধ্যাদেশ নং ২৩, ১৮ জুন ১৯৯৬)। এ আইনের দ্বারা বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটকে একটি স্বশাসিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নপূর্বক চিনি, গুড় ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উপর সার্বিকভাবে গবেষণার জন্য নতুন দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অত:পর ১৯৯৬ সালের ১৭ আগষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সংসদে

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন (১৯৯৬ সনের ১১ নং আইন, ১৭ আগস্ট, ১৯৯৬) প্রণীত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের অন্যান্য স্বশাসিত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NARS) এর অনুরুপ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ২০০২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ আইনটি পুনরায় সংশোধিত হয় (বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট [সংশোধন] আইন, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০২)।

দেশের ক্রমবর্ধমান চিনি ও গুড়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইক্ষুর পাশাপাশি সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, মধু প্রভৃতি চিনি জাতীয় ফসল নিয়ে গবেষণা ত্বরান্বিত করতে 'বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট' এর নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট' নামকরণ করে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় মহান জাতীয় সংসদে বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে 'বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট'-এর ২০১৯ সনের ১৭ নং আইন প্রণীত হয়।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, মধু প্রভৃতি মিষ্টি জাতীয় ফসল নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের চিনি ও গুড়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিএসআরআই হতে অদ্যাবধি ৪৮টি ইক্ষুর উন্নত জাত অবমুক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে ৩ টি চিবিয়ে খাওয়া জাত যা ননমিল জোনে চিবিয়ে খাওয়া এবং গুড় উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের অধিক আয়ের উৎস হিসেবে সমাদৃত। ট্রপিক্যাল সুগারবিটের ২টি জাত যেমন বিএসআরআই সুগারবিট ১ এবং বিএসআরআই সুগারবিট ২, স্টেভিয়ার ১টি জাত বিএসআরআই স্টেভিয়া ১ এবং বারমাসি তালের ১টি জাত বিএসআরআই তাল ১ নিবন্ধিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প (Vision):

অধিক চিনিসমৃদ্ধ স্বল্প মেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য (Mission):

বিভিন্ন চিনি ফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনি ফসলের চাহিদা প্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইক্ষু, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, যষ্টি মধু, মধু প্রভৃতির উপর গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমতল, চরাঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন: লবণাক্ত ও পাহাড়ী এলাকায় বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় ফসলের চাষ সম্প্রসারণ।

কার্যাবলী

(বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯ অনুযায়ী)

১. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা বৃক্ষের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উহাদের উন্নত ও উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;

২. চিনি, গুড়, সিরাপ ও মধু উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা;

৩. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা বৃক্ষের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং উহাদের উপজাতসমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৪. সুগারক্রপ ভিত্তিক গবেষণা, খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা করা এবং উহাদের অর্থনৈতিক সুবিধা চিহ্নিত করা;

৫. বিভিন্ন ধরণের সুগারক্রপের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করিয়া জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়িয়া তোলা এবং সুগারক্রপের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

৬. সুগারক্রপ গবেষণায় জীব প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ ও ক্ষতিকর পোকামাকড় প্রতিরোধ করা এবং খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, ঠাণ্ডা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

৭. সুগারক্রপ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণাগার ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা;

৮. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সুগারক্রপের নূতন জাত ও প্রযুক্তিসমূহের প্রদর্শনীর আয়োজন করা এবং উক্ত জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এলাকা নির্ধারণ ও স্কিম গ্রহণ করা;

৯. মিষ্টিজাতীয় ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির উপর সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, কৃষক এবং দেশি-বিদেশি গবেষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

১০. বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মিষ্টিজাতীয় ফসলের চিহ্নিত সমস্যাবলি সম্পর্কে মতবিনিময় করা এবং মিষ্টিজাতীয় ফসলের সাম্প্রতিক উদ্ভাবনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিচিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;

১১. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় সুগারক্রপ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা;

১২. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ও উদ্ভিদ জাতের মেধাস্বত্ব নিশ্চিত করা;

১৩. সুগারক্রপের সহিত আন্ত:ফসল হিসাবে উপযোগী যে কোনো ফসলের চাষাবাদ সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

১৪. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টিজাতীয় ফসলের বিভিন্ন জাতের দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্রিডার বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করা;

১৫. সুগারক্রপ বিষয়ে স্নাতকোত্তর, পিএইচডি এবং পোস্ট পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা;

১৬. সুগারক্রপের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা;

১৭. সুগারক্রপ গবেষণা ও শিক্ষা সম্প্রসারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ করা;

১৮. সুগারক্রপ গবেষণা সংক্রান্ত মনোগ্রাফ, বুলেটিন ও শস্য পঞ্জিকাসহ ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী, প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা;

১৯. মিষ্টিজাতীয় ফসলের নীতি নির্ধারণে সরকারকে সাহায্য করা এবং মিষ্টিজাতীয় ফসল সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

২০. সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা; এবং

২১. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।

অবকাঠামো

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অবকাঠামো নিম্নরূপ :

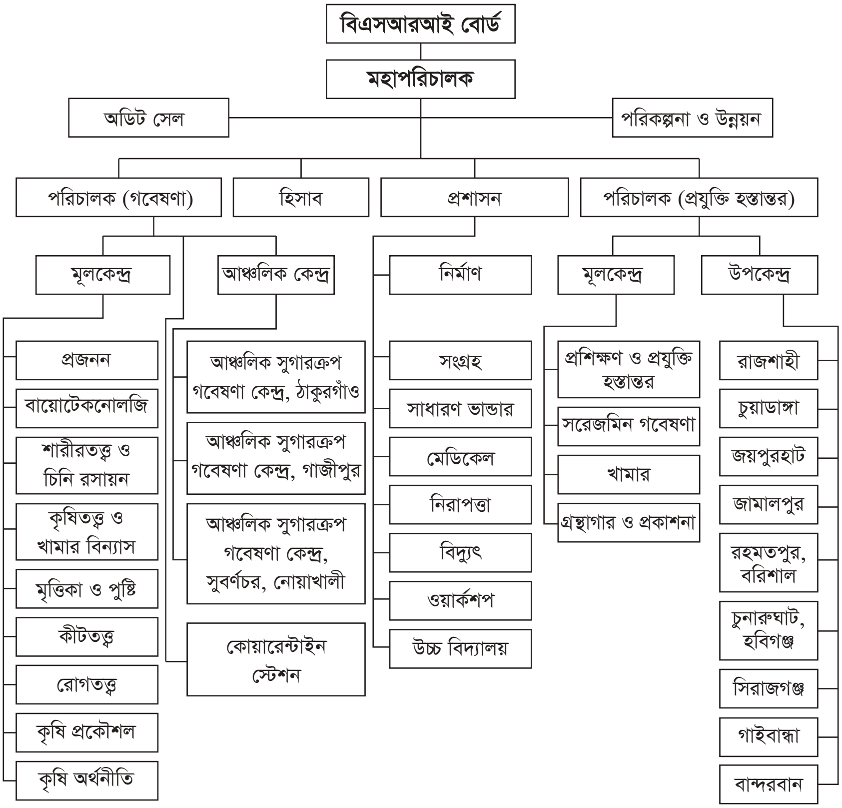

বিএসআরআই বোর্ড

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বিএসআরআই বোর্ড' দ্বারা পরিচালিত হয়। নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের বোর্ড গঠিত হয়েছে।

(ক)	মহাপরিচালক, পদাধিকার বলে	চেয়ারম্যান
(খ)	অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী	সদস্য
(গ)	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী	সদস্য
(ঘ)	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী	সদস্য
(ঙ)	কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মচারী	সদস্য
(চ)	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মচারী	সদস্য
(ছ)	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অন্যূন পরিচালক অথবা সমপদমর্যাদার একজন কর্মচারী	সদস্য
(জ)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর অন্যূন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদমর্যাদার একজন বিজ্ঞানী	সদস্য
(ঝ)	ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণ, পদাধিকার বলে	সদস্য
(ঞ)	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটে কর্মরত ২ (দুই) জন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী	সদস্য
(ট)	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউট বহির্ভূত একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী	সদস্য
(ঠ)	ইনস্টিটিউট কর্তৃক মনোনীত সুগারক্রপ চাষাবাদ সংশ্লিষ্ট কার্যে নিয়োজিত একজন কৃষক ও একজন কৃষাণী	সদস্য
(ড)	ইনস্টিটিউটের প্রশাসন বিভাগের প্রধান	সদস্য-সচিব

কার্যসম্পাদন

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রশাসন ও অর্থায়নসহ গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য বিস্তৃতি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, অডিট ও হিসাব এবং সম্প্রসারণ শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বোপরি দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালককে সহায়তা করেন দু'জন পরিচালক, পরিচালক (গবেষণা) ও পরিচালক (প্রযুক্তি হস্তান্তর)।

ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ, আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রসমূহের গবেষণা কর্মসূচির পরিকল্পনা, মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং সমন্বয় সাধন প্রভৃতি কার্যাবলী পরিচালক (গবেষণা)-এর দায়িত্ব। তাকে সহায়তা করেন একজন গবেষণা সমন্বয়ক এবং গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে এবং প্রতিবেদন, সাময়িকী, পুস্তিকা, লিফলেট, ম্যানুয়াল প্রভৃতি প্রকাশনার মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (প্রযুক্তি হস্তান্তর)।

প্রতিটি গবেষণা বিভাগ ও আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের দায়িত্বে রয়েছেন একজন বিভাগীয় প্রধান বিজ্ঞানী (মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) যাকে সহযোগিতা করেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ঊর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ। উপকেন্দ্রগুলির দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান/ঊর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সমমানের বিজ্ঞানীগণ। আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্র সমূহের বিজ্ঞানীগণ নিজ নিজ এলাকার সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের কাজ করে থাকেন।

বিএসআরআই প্রধান কার্যালয়:

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয় পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে অবস্থিত। রাজধানী ঢাকা শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণে ৩০০ কিলোমিটার দূরে (আরিচা-নগরবাড়ী পথে প্রায় ২০০ কি.মি.) ইনস্টিটিউটটি সড়কপথ, রেলপথ এবং বিমানপথের দ্বারা সংযোগকৃত এবং সমুদ্র সমতল থেকে ১৫.২ মিটার উঁচুতে ২৪°০৭' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯°০৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ কেন্দ্রের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৪৭০-১৮০০ মিলিমিটার, তাপমাত্রা ১৮.২° সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৫.৭° সেন্টিগ্রেড এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫২%-৮৯%। মূল কেন্দ্রটি ৯৫.১৪ হেক্টর জমির উপর অবস্থিত। যার ২৪.২৯ হেক্টর জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের ভবন, রাস্তা, সেচনালা প্রভৃতি। প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা বিভাগ অন্যান্য আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র সমূহের সহিত সমন্বয় রেখে গবেষণার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা বিভাগ ছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। গবেষণা কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্য প্রশাসন বিভাগ, হিসাব বিভাগ সবসময় কর্মে নিয়োজিত থাকেন। অত্র প্রতিষ্ঠানে দুইজন পরিচালক, পরিচালক (গবেষণা) এবং পরিচালক (প্রযুক্তি হস্তান্তর) মহাপরিচালককে গবেষণা কাজে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিস্তারের কাজে সহায়তা করে থাকেন।

বিএসআরআই এর পরিচালকের দপ্তর, গবেষণা বিভাগ, আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রসমূহের কার্যপরিধি

পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তর:

১। প্রতি রোপণ মৌসুমে অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা এবং বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করা।

২। গবেষণা সম্প্রসারণ কর্মশালার সুপারিশ মোতাবেক প্রতিটি গবেষণা বিভাগসহ আঞ্চলিক কেন্দ্র, উপকেন্দ্র সঠিকভাবে গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নে সহযোগিতা করা।

৩। স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪। Annual Research Programme, Annual Report ইত্যাদি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা ।

৫। Monthly, Quarterly & Six monthly progress Report পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তরে সংরক্ষণ করা।

৬। বিভিন্ন প্রকার গবেষণা কাজে এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা প্রদান করা।

৭। সকল বিজ্ঞানীদের মাঠ গবেষণা বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।

পরিচালক (প্রযুক্তি হস্তান্তর) এর দপ্তর:

১। সুগারমিলের কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা এবং প্রগতিশীল কৃষক/কৃষাণীর সমন্বয়ে বাৎসরিক গবেষণা-সম্প্রসারণ কর্মশালার আয়োজন ও প্রকাশনা।

২। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে বিজ্ঞানীদের ডিসিপ্লিন অনুযায়ী প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৩। বিএসআরআই এর খামার বিভাগ, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ কর্তৃক গবেষণা ব্যতিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা।

৪। বিএসআরআই এর উপকেন্দ্র সমূহের প্রশাসনিক ও অন্যান্য সমস্যা সামাধান সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা।

প্রজনন বিভাগ:

১। চিনি ও গুড় উৎপাদী ফসল আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, স্টেভিয়া, গোলপাতা ও অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যায়ন, মূল্যায়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে এ সকল ফসলের জিন ব্যাংক (জার্মপ্লাজম ব্যাংক) গড়ে তোলা।

২। চিনি ও গুড় উৎপাদী ফসল আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, স্টেভিয়া, গোলপাতা ও অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রবর্তন, সংকরায়ন, টিস্যু কালচার, মিউটেশন ব্রিডিং ও মলিকুলার ব্রিডিং ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বায়োটিক ও অ্যাবায়োটিক ঘাতসহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট জাত উদ্ভাবন করা।

৩। নির্বাচিত প্রমিজিং ক্লোনকে জাত হিসেবে অবমুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক অঞ্চলে পিভিটি প্লট বাস্তবায়ন করা এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দলের সংগে মাঠ মূল্যায়ন করা এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে জাত ছাড়করণ বা নিবন্ধন করা।

৪। উদ্ভাবিত জাতসমূহ দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে প্রজননবিদের তত্ত্বাবধানে নিউক্লিয়াস ও ব্রিডার বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা।

৫। উদ্ভাবিত জাত সমূহ সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করা।

৬। দেশ ও বিদেশ হতে সুগারক্রপের জার্মপ্লাজম সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা, বিদেশের সাথে জার্মপ্লাজম বিনিময় করা।

বায়োটেকনোলজি বিভাগঃ

১। বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় ফসলের (আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, স্টেভিয়া ও অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় ফসল বা বৃক্ষ) টিস্যু কালচার প্রটোকল উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও মান নির্ধারণ।

২। জিনগত বিশুদ্ধতা পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় ফসলের টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন করা।

৩। বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন মিষ্টিজাতীয় ফসলের জাতসমূহের মেধাস্বত্ব নির্ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং করা।

৪। মিষ্টি জাতীয় ফসলসমূহের দ্রুত প্রজননের জন্য এবং মার্কার-সহায়তায় নির্বাচন (MAS) সম্পাদন করা।

৫। বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় ফসলের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে জেনেটিক ট্রান্সফর্মেশন ও জিনোম এডিটিং বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা ও সম্পাদন করা।

শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন বিভাগঃ

১। সুগারক্রপের জাতসমূহ অবমুক্তকরণে ঘাতসহিষ্ণু (খরা বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা ইত্যাদি) জেনোটাইপ বাছাইয়ের গবেষণা করা।

২। চিনি ফসলের উৎপাদনশীলতার শারীরবৃত্তীয় ক্লোরোফিল, প্রোলিন, রুট এনাটমি (অ্যারেনকাইমা ইত্যাদি) ভিত্তিক গবেষণা করা।

৩। উচ্চ চিনি এবং কম ফাইবার সমৃদ্ধ আগাম, মধ্যম ও নাবীতে পরিপক্ব আখের জেনোটাইপ বাছাইয়ের গবেষণা করা।

৪। মিষ্টি জাতীয় ফসলসমূহ থেকে উন্নতমানের গুড় উৎপাদন উপযোগী জেনোটাইপ বাছাইয়ের গবেষণা করা।

৫। চিবিয়ে খাওয়া আখের জাত বাছাইয়ের গবেষণা করা।

৬। মিষ্টি জাতীয় ফসলসমূহের পোষ্ট হারভেষ্ট প্রযুক্তির (বাদামী গুড়, চিনি, সিরাপ, তাল মিছরি, স্টেভিওল গ্লাইকোসাইড, মধু ইত্যাদি) উপর গবেষণা করা ও ভ্যালু অ্যাড করা।

৭। মিষ্টি জাতীয় ফসল হতে উচ্চ বাজারমূল্য সম্পন্ন পণ্য তৈরীর প্যাকেজিং এর উপর গবেষণা করা।

৮। গুড়ের শেল্ফ লাইফ সম্পর্কিত গবেষণা করা।

৯। মিষ্টি ফসলের রস এবং গুড়ের গুণগত মানের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা।

কৃষিতত্ত্ব ও ফার্মিং সিস্টেম বিভাগঃ

১। মিষ্টি জাতীয় ফসলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি (রোপণকাল, চারার সংখ্যা, রোপণ পদ্ধতি, জমি নির্বাচন ও তৈরি, আগাছা ব্যবস্থাপনা, সেচ ও সার প্রয়োগ, আন্তঃপরিচর্যা ইত্যাদি) উদ্ভাবন।

২। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কৃষক-বান্ধব লাভজনক প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৩। ইক্ষু ভিত্তিক শস্য বিন্যাস, মুড়ি আখ ও সাথীফসল ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৪। ইক্ষুর গুণগত মান উন্নয়ন ও চিবিয়ে খাওয়ার আখ চাষকে লাভজনক করা।
৫। কৃষকের সমস্যা চিহ্নিত করে ইক্ষু ভিত্তিক খামার পদ্ধতির (Sugarcane Based Farming System) গবেষণার মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টি নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।
৬। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৭। GIS ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের অবস্থা, ফলন পূর্বাভাস এবং জলবায়ু ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ।

মৃত্তিকা ও পুষ্টি বিভাগ:

১। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (AEZ) ভিত্তিক মিষ্টি জাতীয় ফসল ও সাথীফসলের সারের মাত্রা, সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা।
২। সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈব ও অজৈব সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা করা।
৩। মিষ্টি জাতীয় ফসল হতে অনুজীব সনাক্ত করে জীবাণু সার তৈরী, মাত্রা, সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়ক গবেষণা করা।
৪। মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সংরক্ষণশীল কৃষি (Conservation Agriculture) পন্থা অবলম্বন বিষয়ে গবেষণা করা।
৫। গুড়ের গুণগত মান উন্নয়ন লক্ষ্যে ইক্ষু ফসলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ, সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা।
৬। ইক্ষু ফসলের মাটির নমুনা বিশ্লেষণ এবং কান্ড, পাতাসহ অন্যান্য অঙ্গঁজ অংশের নমুনা বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রদান।

কীটতত্ত্ব বিভাগ:

১। মিষ্টি জাতীয় ফসলের (আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, মৌমাছি ইত্যাদি)- ক্ষতিকারক পোকামাকড় পর্যবেক্ষণ, কীটপতঙ্গ সনাক্তকরণ, জীবন বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ, আক্রমণের লক্ষণ ও সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গবেষণা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
২। মিষ্টি জাতীয় ফসলের ক্ষতিকারক পোকার জৈবিক পরজীবী পোকা প্রতিপালন ও মাঠে অবমুক্তকরণ বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
৩। সুগারক্রপের ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনে Gerehceny বিষয়ক গবেষণা করা।
৪। সুগারক্রপের ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশকের Residurl effect বিশ্লেষণ করা।
৫। অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন মৌমাছির জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, উন্নত মৌ রাণী উৎপাদন, মৌমাছির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অধিক মধু উৎপাদনের কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।

রোগতত্ত্ব বিভাগঃ

১। সুগারক্রপের রোগ প্রতিরোধী জেনোটাইপ বাছাই করা।

২। পরিবর্তিত জলবায়ুতে সুগারক্রপের রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩। মেধাস্বত্ব আইন (Intellectual Property Law) নিশ্চিতকল্পে রোগতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক চিহ্নিত সুগারক্রপের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহের সনাক্তকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ।

৪। সুগারক্রপের বিভিন্ন জাতসমূহের দ্রুত বিস্তারের জন্য রোগমুক্ত ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা।

৫। সুগারক্রপের রোগসমূহ সার্ভে ও মনিটরিং করা।

৬। সুগারক্রপের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে প্রয়োগ বিষয়ক গবেষণা করা।

প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগঃ

১। কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী, বিএসএফআইসি ও ডিএই-এর কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা।

২। সুগারক্রপ চাষাবাদে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট, মাঠ দিবস ও কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৩। বিএসআরআই-এর বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানবসম্পদ উন্নয়নে উচ্চশিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

৪। বিএসআরআই হতে প্রাপ্ত নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা।

সরেজমিন গবেষণা বিভাগঃ

১। মাঠ পর্যায়ে বিএসআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের যাচাইকরণ পরীক্ষা।

২। বিএসআরআই উদ্ভাবিত লাভজনক প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারণ।

কৃষি প্রকৌশল বিভাগঃ

১। সুগারক্রপ চাষে কৃষি যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা করা।

২। সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার উপযোগী টেকসই কৃষক বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।

৩। কৃষিতে লাভজনক করতে কৃষি ক্ষেত্রে যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা করা।

৪। ইন্টারনেট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (IOT) এর ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা করা।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগঃ

১। প্রকল্প এবং কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

২। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অফিস, বিভাগ, সংস্থার সহিত সভা ইত্যাদি এর চাহিত তথ্য প্রতিবেদন প্রেরণ।

৩। বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, নীতি, চুক্তি, প্রতিবেদন প্রভৃতি এর উপর সময়মত মতামত প্রদান।

৪। বিভিন্ন সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন।

৫। বিএসআরআই এর বার্ষিক গবেষণার প্রাক বাজেট (প্রকল্প, রাজস্ব, প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা) প্রনয়ন করা।

কৃষি অর্থনীতি বিভাগঃ

১। কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুগারক্রপ যেমনঃ আখ, তাল, খেজুর, গোলপাতা, মধু, স্টেভিয়া সুগারবিট ইত্যাদির অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিরুপণ করা।

২। মাঠ পর্যায়ে বিএসআরআই উদ্ভাবিত সুগারক্রপের জাত ও প্রযুক্তি গ্রহণের হার, লাভজনক, লাভজনকতা নিরুপণ, প্রতিবন্ধকতা এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা।

৩। মিষ্টি জাতীয় ফসল সমূহের বাজার ব্যবস্থাপনা, মূল্য নির্ধারণ ও চাহিদা-সরবরাহের গতিবিধি বিশ্লেষণ করা।

৪। গবেষণা পরিকল্পনা ও মূল্যায়নের জন্য কৃষক পর্যায়ে চিনিফসল চাষাবাদ বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা।

৫। গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশনা, কর্মশালা, ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার করা।

খামার বিভাগঃ

১। শ্রমিকদের হাজিরা ডাকা ও বিভিন্ন গবেষণা বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিক বিতরণ করা।

২। শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে মাস শেষে বেতন সিট তৈরি করা।

৩। বিভিন্ন গবেষণা বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী সার, কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা।

৪। গবেষণা বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী জমি তৈরি করা।

৫। মানসম্মত আখের বীজ, তাল, খেজুর, স্টেভিয়া ও চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষুর চারা তৈরী করা।

৬। উৎপাদিত বীজ আখ বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ, চিনিকল ও সাধারণ কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।

৭। খামারের জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সেচের ব্যবস্থা করা।

৮। যথাসময়ে সার, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক ও জ্বালানী তৈল ক্রয়ের ব্যবস্থা করা।

৯। মানসম্মত আখ, খেজুর, তালের গুড় এবং তালমিশ্রি সহ অন্যান্য পণ্য তৈরী ও বিক্রয় করা।

১০। গবেষণা পরবর্তী আখ চিনিকলে মাড়াইয়ের জন্য সরবরাহ করা।

১১। বিএসআরআই খামারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আখের পাশাপাশি অন্যান্য ফসল যেমন ধান, গম, ডাল জাতীয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদন করা এবং পুকুরে মাছের চাষ করা।

১২। বিএসআরআই ক্যাম্পাসের সকল ফলদ ও বনজ বৃক্ষের পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করা।

১৩। বিএসআরআই ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা।

আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র, ঠাকুরগাঁও

আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র, মাদারগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ১৯৮৫ সাল থেকে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ঠাকুরগাঁও জেলা শহর হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০ কিমি এবং ঠাকুরগাঁও চিনিকল লি. হতে ৫ কি.মি. দূরবর্তী রহিমানপুর ইউনিয়নের মহুভাষী ও কৃষ্ণপুর মৌজার অন্তর্গত ঠাকুরগাঁও চিনিকল লি. এর পটুয়াডাঙ্গী খামার সংলগ্ন মাদারগঞ্জ নামক স্থানে আঞ্চলিক কেন্দ্রটি অবস্থিত। এখানে বর্তমানে ৩ জন বিজ্ঞানী ৪ জন কর্মকর্তা ১১ জন সহায়ক কর্মচারীসহ মোট ১৮ জন জনবল রয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রটির জমির পরিমাণ ৯.৫০ একর যার মধ্যে অফিস, গবেষণা ও আবাসিক ভবন এবং গবেষণা মাঠ অবস্থিত। এ কেন্দ্রে একটি প্রশাসনিক ভবন, একটি গবেষণা ভবন, ট্রেনিং ক্লাসরুম, ট্রেনিং ডরমিটরী, সেচ কাজে ব্যবহৃত একটি গভীর পাম্প, জেনারেটর রুম, গুড় শেড, গ্যারেজ, সুসজ্জিত নিরাপত্তা চৌকি, মসজিদ এবং তিনটি আবাসিক ভবন রয়েছে।

দেশের উত্তরাঞ্চলের বিশেষত: কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১ এলাকার জন্য উপযুক্ত উচ্চ ফলনশীল, উচ্চ চিনিযুক্ত, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী এবং খরা ও বন্যাসহিষ্ণু ইক্ষু জাত বাছাই করা এ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও ইক্ষু চাষে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ, রোগ ও পোকামাকড় দমনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, মাঠ পরীক্ষার মাধ্যমে মাটিতে উপযুক্ত সারের চাহিদা নিরূপণ এবং কৃষককে আর্থিকভাবে লাভবান করার জন্য ইক্ষুর সাথে লাগসই ও উচ্চমূল্যের সাথীফসল চাষাবাদ ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করার নিমিত্তে এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে।

চিত্র ১: আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র, ঠাকুরগাঁও এর গবেষণা ভবন

আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর

আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর মিলবর্হিভূত এলাকায় ইক্ষু চাষ সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণা ও উচ্চ ফলন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে কৃষক পর্যায়ে বিএসআরআই এর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণের নিমিত্তে গাজীপুর সদর উপজেলায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে ১৯৭৯ সালে স্থাপিত কোয়ারেন্টাইন স্টেশন, গাজীপুর এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০২ সালে ক্যাডেট কলেজ আবাসিক এলাকা, গাজীপুরে ভাড়াকৃত অফিসের মাধ্যমে আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে গাজীপুর চৌরাস্তা হতে ৫-৬ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর পিছনে এবং যোগীতলায় ব্র্যাক রিসার্চ সেন্টারের উত্তর-পূর্ব দিকে কেন্দ্রটি অবস্থিত। গবেষণার সুবিধার্থে ২০০৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) থেকে ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করে নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। আঞ্চলিক কেন্দ্রের ১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ৭ একর গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়।

তিন তলা বিশিষ্ট ভবনটিতে একটি ল্যাবরেটরী কাম অফিস ভবন ও ট্রেনিং ক্লাস রুম রয়েছে। এছাড়াও একটি টিনসেড আনসার ব্যারাক ও একটি গুড় তৈরীর শেড বিদ্যমান।

আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুরে বর্তমানে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও স্টেশন ইনচার্জ ১ জন, ১ জন ঊর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন কর্মকর্তা ও ৪ জন সহায়ক কর্মচারী কর্মরত আছে।

চিত্র ২: আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর এর গবেষণা ভবন

কোয়ারেন্টাইন স্টেশন, গাজীপুর

বহি:বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত ইক্ষুর জার্মপ্লাজম সমূহ নিবিড় পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ক্যাম্পাসে ১৯৭৯ সালে ইক্ষুর কোয়ারেন্টাইন স্টেশন স্থাপিত হয়। সর্বমোট জমির পরিমাণ ০.৭৫ একর, যার মধ্যে আনুমানিক ০.৫০ একর চাষযোগ্য। একটি অফিস ভবন ও ল্যাব কাম অপারেটর রুম এবং চার কক্ষ বিশিষ্ট একটি গ্লাস হাউজ বিদ্যমান। বর্তমানে স্টেশনটি আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে বিশ্বের ১৬ টি দেশ হতে সংগৃহীত ৪০২ টি জার্মপ্লাজমের মধ্যে বর্তমানে ৬৭ টি এবং ১৮ টি কোয়ারেন্টাইনকৃত স্থানীয় চিবিয়ে খাওয়া জার্মপ্লাজম নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছে। সংগৃহীত ইক্ষুর জার্মপ্লাজম সমূহ কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিএসআরআই প্রজনন বিভাগের জার্মপ্লাজম ব্যাংকে হস্তান্তর করা হয়।

চিত্র ৩: কোয়ারেন্টাইন স্টেশন (ব্রি ক্যাম্পাস, গাজীপুর)

আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

চরাঞ্চল ও লবণাক্ত এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া ও গুড় উৎপাদন উপযোগী ইক্ষুজাত সমূহ চাষের স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত ও সে বিষয়ে গবেষণা করা, ইক্ষুর উচ্চ ফলন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে কৃষক পর্যায়ে বিএসআরআই-এর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি সমূহের সম্প্রসারণের নিমিত্তে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমম্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২০১৭ সালে ৮৭ নং চর জুবলী মৌজায় ৯.৫৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে উক্ত কেন্দ্রে একটি স্থায়ী অফিস ভবন নির্মাণ করা হয় এবং গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। যার মধ্যে আনুমানিক ৬.০ একর জমি

চাষযোগ্য। এ কেন্দ্রে একটি ল্যাব-কাম অফিস ভবন আছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রটিতে ১ জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন মাঠ সহকারী এবং ১ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কর্মরত রয়েছে।

চিত্র ৪: আঞ্চলিক সুগারক্রপ গবেষণা কেন্দ্র, সুবর্ণচর, নোয়াখালী এর গবেষণা ভবন

বিএসআরআই উপকেন্দ্র, রাজশাহী

রাজশাহী বিভাগীয় মহানগরীর কাজিহাটায় ভাড়াকৃত বাসায় অবস্থিত রাজশাহী উপকেন্দ্রটি ইক্ষুচাষের স্থানীয় সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৮৯ সাল থেকে এ উপকেন্দ্রটিতে প্রদর্শনী এবং সরেজমিন গবেষণা ও উদ্ভাবিত নতুন ইক্ষু প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপকেন্দ্রটিতে ১ জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন ঊর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ৪ জন সহায়ক কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

চিত্র ৫: বিএসআরআই উপকেন্দ্র, রাজশাহী

বিএসআরআই উপকেন্দ্র, জয়পুরহাট

ইক্ষু চাষের সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে জয়পুরহাট জেলা শহরে ১৯৮৬ সালে জয়পুরহাট সুগারমিলে স্থাপিত অফিসের মাধ্যমে বিএসআরআই উপকেন্দ্র, জয়পুরহাট এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, জয়পুরহাট উপকেন্দ্রের নিজস্ব কোন অফিস ভবন নেই। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে জয়পুরহাট শহরের প্রফেসর পাড়ায় ভাড়া

বাসায় অফিস স্থানান্তর করা হয় যা বর্তমানে স্টেডিয়াম রোডে অবস্থিত। অফিসটিতে বর্তমানে ১ জন ঊর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন বৈজ্ঞানিক সহকারী এবং ১ জন অফিস সহকারী কর্মরত রয়েছে।

চিত্র ৬: বিএসআরআই উপকেন্দ্র, জয়পুরহাট

বিএসআরআই উপকেন্দ্র, জামালপুর

ইক্ষুর উচ্চ ফলন প্রাপ্তি নিশ্চিত করণে কৃষক পর্যায়ে ইক্ষু চাষের স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধান করার জন্য বিএসআরআই-এর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণের নিমিত্তে জামালপুর জেলা শহরের মিয়াপাড়ায় ১৯৮৯ সালে ভাড়াকৃত অফিসের মাধ্যমে বিএসআরআই জামালপুর উপকেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর খামারের জমি অধিগ্রহণ করে ২০০২ সালে স্থায়ী অফিস ভবন স্থাপন করা হয়।

জামালপুরস্থ টাঙ্গাইল বাসস্ট্যান্ড হতে ৬ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে চন্দ্রা নামক স্থানে উপকেন্দ্রটি অবস্থিত। উপকেন্দ্রের সর্বমোট জমির পরিমাণ ২ একর। যার মধ্যে আনুমানিক ১.৫ একর চাষযোগ্য। উপকেন্দ্রটিতে একটি ল্যাব-কাম অফিস ভবন ও একটি গুড় শেড বিদ্যমান আছে। বর্তমানে এ উপকেন্দ্রে ১ জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ২ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ২ জন সহায়ক কর্মচারী কর্মরত আছে।

চিত্র ৭: বিএসআরআই উপকেন্দ্র, জামালপুর

বিএসআরআই উপকেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা

বিএসআরআই এর চুয়াডাঙ্গা উপকেন্দ্র দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (সমগ্র খুলনা বিভাগ) বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের একমাত্র উপকেন্দ্র। উপকেন্দ্রটি ১৯৮১ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের কেদারগঞ্জে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীতে দর্শনাহল্ট রেল স্টেশনের সন্নিকটে, কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড চিনিকলের আকন্দবাড়ীয়ায় পরীক্ষামূলক ইক্ষু খামারের ২ (দুই) একর জমি অধিগ্রহণ করে ২০০৮ সালে সেখানে উপকেন্দ্রের জন্য স্থায়ী ভবন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এখানে ১ জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ১ জন পরীক্ষাগার পরিচর কর্মরত রয়েছে।

চিত্র ৮: বিএসআরআই উপকেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা

বিএসআরআই উপকেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল

বরিশাল অঞ্চল সামগ্রিকভাবে নন মিলজোন এলাকা। চিবিয়ে খাওয়া ও গুড় উৎপাদনই এ এলাকার ইক্ষুচাষের মূল উপজীব্য। স্থানীয় পর্যায়ে ইক্ষু চাষের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এর সমাধান করে, ইক্ষুর উচ্চ ফলন প্রাপ্তি নিশ্চিত করণে কৃষক পর্যায়ে বিএসআরআই-এর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি সমূহের সম্প্রসারণের নিমিত্তে বরিশাল জেলার রহমতপুরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় হর্টিকালচার সেন্টার হতে জমি অধিগ্রহণ করে ২০০২ সালে উপকেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়।

বরিশাল বাসস্ট্যান্ড হতে ১৪ কি.মি. উত্তরে রহমতপুরস্থ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ক্যাম্পাস (নারিকেল বাগান)-এ উপকেন্দ্রটি অবস্থিত। উপকেন্দ্রের সর্বমোট জমির পরিমাণ ৩ একর। যার মধ্যে আনুমানিক ১.৫ একর চাষযোগ্য। এই উপকেন্দ্রেটিতে একটি ল্যাব-কাম অফিস ভবন ও একটি গুড় শেড বিদ্যমান আছে। উপকেন্দ্রটিতে ২ জন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকতা এবং ১ জন মাঠ সহকারী কর্মরত আছে।

চিত্র ৯: বিএসআরআই উপকেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল

বিএসআরআই উপকেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ

যমুনা নদীর চরাঞ্চলে ইক্ষু চাষের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান করে ইক্ষুর উচ্চ ফলন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে কৃষক পর্যায়ে বিএসআরআই এর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি সমূহের সম্প্রসারণের নিমিত্তে সিরাজগঞ্জ জেলা শহরে ২০০৬ সালে ভাড়াকৃত অফিসের মাধ্যমে বিএসআরআই সিরাজগঞ্জ উপকেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। উপকেন্দ্রটি সিরাজগঞ্জ শহরের হোসেনপুরে অবস্থিত। উপকেন্দ্রটিতে ০১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ০২ জন সহায়ক কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

চিত্র ১০: বিএসআরআই উপকেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ

বিএসআরআই উপকেন্দ্র, চুনারুঘাট

খোয়াই নদীর তীরবর্তী Flash flood এলাকায় কৃষক পর্যায়ে বিএসআরআই এর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি সমূহের সম্প্রসারণের নিমিত্তে এবং ইক্ষু চাষের স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধান করে ইক্ষুর উচ্চ ফলন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় ২০০৬ সালে ভাড়াকৃত অফিসে বিএসআরআই চুনারুঘাট উপকেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদ হতে আনুমানিক ১ কিলোমিটার উত্তরে চুনারুঘাট-হবিগঞ্জ প্রধান সড়কের বাম পার্শ্বে উত্তর বাজার নামক স্থানে উপকেন্দ্রটি অবস্থিত। বর্তমানে উপকেন্দ্রটিতে ১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ১ জন সহায়ক কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

চিত্র ১১: বিএসআরআই উপকেন্দ্র, চুনারুঘাট

বিএসআরআই উপকেন্দ্র, গাইবান্ধা

মহিমাগঞ্জ চিনিকল এলাকায় বিএসআরআই গাইবান্ধা উপকেন্দ্রটি ইক্ষু চাষের স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধান করে ইক্ষুর উচ্চ ফলন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে কৃষক পর্যায়ে বিএসআরআই এর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণের নিমিত্তে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নে জমি অধিগ্রহণ ও স্থায়ী অফিস ভবন নির্মাণ করে ২০২০ সাল থেকে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড হতে ১২ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে দরবস্ত ইউনিয়নের বৈঠাখালী নামক স্থানে উপকেন্দ্রটি অবস্থিত। উপকেন্দ্রের সর্বমোট জমির পরিমাণ ১০ একর। যার মধ্যে আনুমানিক ০১ একর চাষযোগ্য এবং জলাবদ্ধতার কারণে অবশিষ্ট জমি চাষের অনুপযোগী। মাটি দ্বারা জমি ভরাট করে ইক্ষু চাষাবাদ উপযোগী করা অত্যাবশ্যক। উপকেন্দ্রের একটি ল্যাব-কাম অফিস ভবন বিদ্যমান আছে। উপকেন্দ্রটিতে ১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন নিরাপত্তা প্রহরী, ৬ জন আনসার এবং ৬ জন অস্থায়ী শ্রমিক কর্মরত আছে।

চিত্র ১২: বিএসআরআই উপকেন্দ্র, গাইবান্ধা

বিএসআরআই উপকেন্দ্র, বান্দরবান

বান্দরবান জেলা শহরের জাদি পাড়ায় ২০০৫ সালে ভাড়াকৃত অফিসের মাধ্যমে বিএসআরআই বান্দরবান উপকেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে বান্দরবান, লেমুঝিড়ি পাড়ায় জমি অধিগ্রহণ করে ২০২২ সালে স্থায়ী অফিস ভবন স্থাপন করা হয়। বান্দরবান বাসস্ট্যান্ড হতে ০৩ কি.মি. দূরে লেমুঝিড়ি পাড়ায় উপকেন্দ্রটি অবস্থিত। এই উপকেন্দ্রের পশ্চিমে বান্দরবান সেনানিবাস অবস্থিত। উপকেন্দ্রের সর্বমোট জমির পরিমাণ ১ একর। যার মধ্যে আনুমানিক ০.৪ একর চাষযোগ্য। এই উপকেন্দ্রে একটি গুড় শেড এবং একটি ক্রসিং শেড বিদ্যমান আছে। যে সমস্ত ইক্ষুর জার্মপ্লাজমে ফুল আসেনা সে সমস্ত ইক্ষু চাষাবাদ করে ইক্ষুর ফুল ফুটানোর চেষ্টা করা এই কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য। ইক্ষু চাষের

সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধান এবং ইক্ষুর উচ্চ ফলন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে পার্বত্য এলাকায় কৃষক পর্যায়ে বিএসআরআই-এর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি সমূহের সম্প্রসারণের জন্য এ উপকেন্দ্রটি কাজ করে যাচ্ছে। উপকেন্দ্রটির সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, দিবস দৈর্ঘ্য, সামুদ্রিক আবহাওয়া এবং তাপমাত্রা ইক্ষুর ফুল ফোটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হওয়ায় এখানে অনেক জার্মপ্লাজমে ফুল হচ্ছে যেগুলোতে ঈশ্বরদীর আবহাওয়াতে ফুল হয় না। ফলশ্রুতিতে এ উপকেন্দ্র ইক্ষুর সংকরায়নের কাজে সহায়তা করার ইক্ষুর নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। উপকেন্দ্রটিতে ১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ১ জন অস্থায়ী শ্রমিক কর্মরত আছে।

চিত্র ১৩: বিএসআরআই উপকেন্দ্র, বান্দরবান

গবেষণা কর্মসূচি পরিকল্পনা, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর বার্ষিক গবেষণা কর্মসূচি তিনটি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছর বার্ষিক গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের পূর্বে 'গবেষণা-সম্প্রসারণ' কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় চিনিকলের কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সুগারক্রপ চাষে প্রগতিশীল কৃষক অংশগ্রহণ করে থাকেন। কর্মশালায় ইক্ষুচাষ বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং চিহ্নিত সমস্যার আলোকে গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়। বিজ্ঞানীগণ তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা-সম্প্রসারণ কর্মশালায় প্রণীত সুপারিশ এর আলোকে নিজ নিজ গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। এরপর ঐ গবেষণা কর্মসূচিগুলি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং উর্দ্ধতন বিজ্ঞানীগণ পর্যালোচনা করেন। এ পর্যালোচনা কর্মশালায় বিজ্ঞানীগণ গবেষণার ফলাফল এবং তথ্যসূত্রও উপস্থাপন করেন। এভাবেই দীর্ঘ আলোচনা সমালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংযোজন পরিমার্জনের পর গবেষণা কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়। বিএসআরআই তার গবেষণা কর্মসূচি পর্যালোচনার জন্য সাধারণত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি), গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রভৃতি), সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার বিভিন্ন চিনিকল সমূহ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ) এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং উর্দ্ধতন গবেষকবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। চূড়ান্ত গবেষণা কর্মসূচি প্রণীত হবার পর সেগুলো বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ এবং আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ বাস্তবায়ন করে থাকেন। বিএসআরআই এর প্রধান গবেষণা ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরুপ:

গবেষণা ক্ষেত্রসমূহ	অংশগ্রহণকারী বিভাগ
১। সুগারক্রপের জাত উদ্ভাবন/উন্নয়ন	প্রজনন, বায়োটেকনোলজি, শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা ও পুষ্টি, রোগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, কৃষি প্রকৌশল, সরেজমিন গবেষণা ও কৃষি অর্থনীতি
২। ইক্ষু প্রজননের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কৌশলগত গবেষণা	প্রজনন, বায়োটেকনোলজি, শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন, রোগতত্ত্ব ও কীটতত্ত্ব
৩। বায়োটেকনোলজি ও অগ্রবর্তী (frontier) গবেষণা	বায়োটেকনোলজি, প্রজনন, শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন, রোগতত্ত্ব ও কীটতত্ত্ব
৪। কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা	কৃষিতত্ত্ব, প্রজনন, মৃত্তিকা ও পুষ্টি, শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন, রোগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, কৃষি প্রকৌশল, সরেজমিন গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, কৃষি অর্থনীতি
৫। মৃত্তিকা উর্বরতা ব্যবস্থাপনা	মৃত্তিকা ও পুষ্টি, কৃষিতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন, সরেজমিন গবেষণা, রোগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব
৬। ক্ষতিকর পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা	কীটতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন, প্রজনন, বায়োটেকনোলজি, মৃত্তিকা ও পুষ্টি, সরেজমিন গবেষণা ও কৃষি অর্থনীতি
৭। সংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনা	রোগতত্ত্ব, মৃত্তিকা ও পুষ্টি, শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন, সরেজমিন গবেষণা, কীটতত্ত্ব, প্রজনন, কৃষিতত্ত্ব ও কৃষি অর্থনীতি
৮। মৌমাছি ও মধু গবেষণা	কীটতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, প্রজনন, সরজমিন গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, কৃষি অর্থনীতি
৯। চিনি ও গুড় প্রক্রিয়াজাতকরণ	শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন, বায়োটেকনোলজি, সরেজমিন গবেষণা, কৃষি প্রকৌশল ও কৃষি অর্থনীতি
১০। খামার যান্ত্রিকীকরণ	কৃষি প্রকৌশল, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা ও পুষ্টি
১১। সুগারক্রপের বাই-প্রোডাক্ট এর ব্যবহার	শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন, কৃষিতত্ত্ব, বায়োটেকনোলজি, সরেজমিন গবেষণা, কৃষি প্রকৌশল, রোগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব এবং মৃত্তিকা ও পুষ্টি
১২। সহায়ক অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়ন	প্রজনন, শারীরতত্ত্ব ও চিনি রসায়ন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষিতত্ত্ব, বায়োটেকনোলজি, সরেজমিন গবেষণা, মৃত্তিকা ও পুষ্টি, কীটতত্ত্ব এবং প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কৃষি অর্থনীতি
১৩। কৃষি অর্থনীতি ও প্রযুক্তি হস্তান্তর	সরেজমিন গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রসমূহ

অর্থায়ন

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) প্রধানত: বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয়। তবে অতীতে অন্যান্য বৈদেশিক উৎস যেমন পি-এল ৪৮০, বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া চিনি শিল্প প্রকল্প (BASIP), আইডিএ/বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি থেকেও অর্থের যোগান পাওয়া গেছে।

যোগসূত্র

ইতোমধ্যেই অত্র ইনস্টিটিউট দেশে ও বিদেশে সুগারক্রপ গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। দেশের মধ্যে এটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের আওতাভূক্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কিছু বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তথ্য আদান প্রদান ও জাত বিনিময়ের মাধ্যমে এই ইনস্টিটিউটের একটি সুন্দর যোগসূত্র ছিল। তথ্য বিনিময়ের নেটওয়ার্কে এ ইনস্টিটিউটি নিম্নোক্ত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বর্তমানেও বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।

- CIRAD, Montpellier, Cedex 5, France
- Indian Institute of Sugarcane Research, Lacknow, India.
- Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore, India
- South African Sugar Association, Expt. Station, Natal, South Africa
- Mauritius Sugar Industry Research Institute, Reduit, Mauritius
- Sama Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria
- Shakargonj Sugar Research Institute, Jhang-Punjau, Pakistan
- Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA
- Taiwan Sugar Research Institute, Tainan, Taiwan
- Bureau of Sugar Experiment Station, Queensland, Australia
- Indonesian Sugar Research Institute, Pasuram, Indonesia.
- Philippines Sugar Research Institute, Makati City, Philippines.

উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম

প্রযুক্তি হস্তান্তর বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণার পাশাপাশি একটি অন্যতম কার্যক্রম। প্রযুক্তি হস্তান্তরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চিনিকলের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অগ্রবর্তী ইক্ষুচাষীদের প্রশিক্ষণ; হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তির মাঠ প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষী সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, দলগত আলোচনা প্রভৃতি আয়োজনের ব্যবস্থা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন, সাময়িকী, লিফলেট, পুস্তিকা প্রভৃতি প্রকাশনা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত বিভিন্ন জেলায় কৃষি কারিগরী কমিটির সভায় বিজ্ঞানীগণ নিয়মিত যোগদান করেন। দেশের মধ্যে সুগারক্রপ বিষয়ক তথ্যের জন্য অত্র ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারটিই সর্বোত্তম স্থান। বিজ্ঞানীগণ মাঠ পর্যায়ের যে কোন সমস্যায় সমস্যাবহুল এলাকায় গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ও সমস্যা থেকে উত্তরণে উপযুক্ত পরামর্শ প্রতিবেদন প্রদান করে থাকেন।

চিত্র ১৪: ইক্ষুচাষী প্রশিক্ষণ

চিত্র ১৫: উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

চিত্র ১৬: ইক্ষু উন্নয়ন সহকারীদের প্রশিক্ষণ

গবেষণায় অর্জিত সাফল্য

উন্নত ইক্ষুজাত উদ্ভাবন: বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ৪৮টি ইক্ষুজাত উদ্ভাবন করেছে। এছাড়াও সুগারবিটের ২টি, তালের ১টি ও স্টেভিয়ার ১টি জাত নিবন্ধিত করেছে। সবগুলিই উচ্চফলনশীল ও অধিক চিনিসমৃদ্ধ। এ সকল জাতের তথ্যাবলী সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রদত্ত হলো:

বিএসআরআই কর্তৃক এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত ও নিবন্ধিত জাতের মোট সংখ্যা ৫২টি। ইক্ষুর ৪৮টি জাতের মধ্যে ১৬টি জাত যথা- ঈশ্বরদী ২-৫৪, ঈশ্বরদী ১৬, ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ২৬, ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৪, ঈশ্বরদী ৩৬, ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫, বিএসআরআই আখ ৪৬ এবং বিএসআরআই আখ ৪৮। উক্ত জাতগুলো চিনিকলের প্রায় ৯৯% এলাকায় চাষাবাদে রয়েছে। বিএসআরআই উদ্ভাবিত গুড় তৈরীর উপযোগী জাত ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই আখ ৪১, বিএসআরআই আখ ৪৫, বিএসআরআই আখ ৪৮ এবং চিবিয়ে ও রস করে খাওয়া উপযোগী জাতসমূহ যথা- বিএসআরআই আখ ৪১, বিএসআরআই আখ ৪২ ও বিএসআরআই আখ ৪৭ মিল বর্হিভূত প্রায় ৮০% এর অধিক এলাকায় আবাদ হচ্ছে। যা কৃষকদের মাঝে অধিক আয়ের উৎস হিসেবে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

টেবিল ১. বিএসআরআই উদ্ভাবিত সুগারক্রপ ফসলের জাতসমূহের ফলন, চিনি ধারণ ক্ষমতা ও পরিপক্বতা

জাতের নাম	অবমুক্তির বছর	ফলন (টন/হেক্টর)	গড় চিনি ধারণ ক্ষমতা (%)	পরিপক্বতা
ইক্ষু				
ঈশ্বরদী ২-৫৪	১৯৬৭	৭৯	১২.৯৭	মধ্যম
ঈশ্বরদী ১৬	১৯৮১	৯২	১৪.৪৮	আগাম
এলজেসি	১৯৮২	৭৯	১৩.১৯	মধ্যম
ঈশ্বরদী ২৬	১৯৯৫	৬০	১৪.৭৪	আগাম
ঈশ্বরদী ৩২	২০০২	১০৪	১২.৬০	মধ্যম
ঈশ্বরদী ৩৩	২০০২	৯৯	১৪.৯৫	আগাম
ঈশ্বরদী ৩৪	২০০২	৯৩	১২.৮৩	মধ্যম
ঈশ্বরদী ৩৬	২০০৩	৮৯	১৪.৬০	আগাম
ঈশ্বরদী ৩৭	২০০৬	১০১	১৪.৪২	আগাম
ঈশ্বরদী ৩৯	২০০৯	১০১	১৪.২৩	আগাম
ঈশ্বরদী ৪০	২০০৯	১০৩	১৪.৮৬	আগাম
বিএসআরআই আখ ৪১	২০১২	১৩৯	১২.১০	মধ্যম
বিএসআরআই আখ ৪২	২০১৪	১৬৯	১২.১১	আগাম
বিএসআরআই আখ ৪৩	২০১৪	১১৮	১২.৩০	আগাম
বিএসআরআই আখ ৪৪	২০১৪	১০৬	১২.৪২	আগাম
বিএসআরআই আখ ৪৫	২০১৬	১০৫	১৩.৯৪	আগাম
বিএসআরআই আখ ৪৬	২০১৭	১০৩	১২.৯১	মধ্যম
বিএসআরআই আখ ৪৭	২০২০	১৮৩	১১.৫৫	আগাম
বিএসআরআই আখ ৪৮	২০২১	১০৬	১৩.৯৮	আগাম
সুগারবিট				
বিএসআরআই সুগারবিট ১	২০১৭	৭০-৮৪	১৩-১৬	স্বল্প মেয়াদী ৫ মাসে মাড়াইযোগ্য
বিএসআরআই সুগারবিট ২	২০১৭	৭৫-৮৫	১৩-১৫	স্বল্প মেয়াদী ৫ মাসে মাড়াইযোগ্য
তাল				
বিএসআরআই তাল ১	২০১৮	৮৭	৯-১৩	বারমাসি
স্টেভিয়া				
বিএসআরআই স্টেভিয়া ১	২০১৮	সবুজ পাতা ৩৬০০ কেজি/হেক্টর শুকনো পাতা ৯৪০ কেজি/হেক্টর	শুকনো পাতার মিষ্টতা চিনির চেয়ে ৩০-৪০ গুন বেশি	আগাম

বিএসআরআই উদ্ভাবিত কয়েকটি উন্নত ইক্ষুজাতঃ

চিত্র ১৭: বিএসআরআই আখ ৪৩

চিত্র ১৮: বিএসআরআই আখ ৪৪

চিত্র ২০: বিএসআরআই আখ ৪৫

চিত্র ২১: বিএসআরআই আখ ৪৬

চিত্র ২১: বিএসআরআই আখ ৪৮

পরিপক্বতার ভিত্তিতে ইক্ষুজাতসমূহঃ

- ইক্ষু জাতসমূহ আগাম, মধ্যম এবং দেরীতে পরিপক্ব জাত হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

  আগাম ইক্ষুজাতঃ ঈশ্বরদী ৩৮, ঈশ্বরদী ৩৯ ও ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই আখ ৪২, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫, বিএসআরআই আখ ৪৭ ও বিএসআরআই আখ ৪৮।

  মধ্যম ইক্ষুজাতঃ বিএসআরআই আখ ৪১ ও বিএসআরআই আখ ৪৬।

  দেরীতে পরিপক্ব ইক্ষুজাতঃ

- পরিপক্বতার ধরণ অনুযায়ী ইক্ষু কর্তন ও মাড়াই সম্ভব।
- পরিপক্বতার ধরণ অনুযায়ী ইক্ষু কর্তন ও মাড়াই করা হলে অধিক চিনি/গুড় আহরণ সম্ভব।
- ব্যবস্থাপনা সহজ।
- অধিক চিনি/গুড় আহরণ হয় বলে চাষী/গুড় উৎপাদনকারীগণ বর্ধিত আর্থিক সুবিধা পায়।
- গুড় উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা আগাম গুড় উৎপাদনে অধিক লাভবান হতে পারে।

প্রতিকূল (খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা) পরিবেশে চাষযোগ্য ইক্ষুজাতসমূহঃ

খরা সহিষ্ণু জাতসমূহঃ ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ৩৫, ঈশ্বরদী ৩৬, ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৮, ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫, বিএসআরআই আখ ৪৬ ও বিএসআরআই আখ ৪৮।

জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু জাতসমূহঃ ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৪, ঈশ্বরদী ৩৫, ঈশ্বরদী ৩৬, ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৮, ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫ ও বিএসআরআই আখ ৪৬।

বন্যা সহিষ্ণু জাতসমূহ : ঈশ্বরদী ৩৪, ঈশ্বরদী ৩৫, ঈশ্বরদী ৩৬, ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৮, ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫, বিএসআরআই আখ ৪৬ ও বিএসআরআই আখ ৪৮।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতসমূহঃ ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪ বিএসআরআই আখ ৪৫, বিএসআরআই আখ ৪৬ ও বিএসআরআই আখ ৪৮।

উন্নত গুড় উৎপাদন উপযোগী ইক্ষুজাতসমূহঃ

- ❖ উন্নত গুড় উৎপাদন উপযোগী ৮ টি ইক্ষুজাত বাছাই এবং অবমুক্ত করা হয়েছে।
- ❖ ঈশ্বরদী ৩৮, ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই আখ ৪১, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫ ও বিএসআরআই আখ ৪৮।
- ❖ উন্নতমানের গুড় উৎপাদন করা যায়।
- ❖ উৎপাদিত গুড়ের রং সোনালী হরিদ্রা বর্ণের হয় যা ভোক্তার নিকট আকর্ষণীয়।
- ❖ কোন রাসায়নিক পরিশোধক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
- ❖ গুড় আহরণ হার অধিক হয়।
- ❖ চাষী/গুড় উৎপাদনকারীগণ অধিক লাভবান হয়।

মুড়ি ইক্ষু চাষোপযোগী ইক্ষুজাতসমূহঃ

ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৪, ঈশ্বরদী ৩৯, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৫, বিএসআরআই আখ ৪৬ ও বিএসআরআই আখ ৪৮।

চিবিয়ে খাওয়া উপযোগী ইক্ষুজাতসমূহঃ

- ❖ চিবিয়ে খাওয়া উপযোগী ০৩ টি ইক্ষুজাত বাছাই এবং অবমুক্ত করা হয়েছে।
- ❖ বিএসআরআই আখ ৪১, বিএসআরআই আখ ৪২ এবং বিএসআরআই আখ ৪৭।

- ❖ দেশের প্রায় সব এলাকায় বিস্তৃতভাবে চাষাবাদ হয় বিএসআরআই আখ ৪১ এবং বিএসআরআই আখ ৪২।
- ❖ বিএসআরআই আখ ৪২ জাতটি অধিকতর নরম রসালো এবং কম আঁশযুক্ত হওয়ায় ভোক্তার নিকট অধিক জনপ্রিয় ।
- ❖ বিএসআরআই আখ ৪৭ কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান এলাকায় চাষের জন্য উপযোগী।

বিএসআরআই উদ্ভাবিত চিবিয়ে খাওয়া উন্নত ইক্ষুজাতঃ

চিত্র ২২: বিএসআরআই আখ ৪১

চিত্র ২৩: বিএসআরআই আখ ৪২

চিত্র ২৪: বিএসআরআই আখ ৪৭

'রোপা ইক্ষু চাষ' (এসটিপি) প্রযুক্তি সুপারিশ করা হয়েছে যা ইক্ষু চাষকে কম বীজে অধিক লাভজনক করতে পারে। 'রোপা ইক্ষু চাষে'র সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

রোপা ইক্ষু চাষ পদ্ধতির সুবিধা হলো ক্রপ কমপিটিশনে টিকে থাকার জন্য রোপণের আগেই ইক্ষুর চারা তৈরি করে রাখা যায়। জমি ফাঁকা হলেই জমিতে ইক্ষুর চারা রোপণ করা যায়।

- ❖ প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় মাত্র ৪০% বীজ ইক্ষুর প্রয়োজন হয়।
- ❖ জমিতে মাড়াইযোগ্য ইক্ষুর সংখ্যা ও ওজন বৃদ্ধি হয়।
- ❖ প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এতে বীজ বর্ধন অনুপাত বৃদ্ধি পায় (১:৩০)
- ❖ ইক্ষুর ফলন ও অর্থনৈতিক সুবিধা ৫০%-৮০% ভাগ বৃদ্ধি পায়।
- ❖ গ্রাম এলাকায় বাড়তি কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- ❖ রোপা পদ্ধতিতে ইক্ষুচাষকে আরো সহজ ও সুবিধাজনক করার জন্য ইক্ষুর স্টকলেস চারা তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ইক্ষু চারা উৎপাদন, পরিবহন ও রোপণ স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন করা যায়।

সাথীফসল প্রযুক্তি এবং জোড়া সারি পদ্ধতিতে রোপণকৃত ইক্ষুর সাথে পর্যায়ক্রমিক একাধিক সাথী ফসল চাষ প্রযুক্তি সুপারিশ করা হয়েছে।

টেবিল ২. একসারি/জোড়াসারি ইক্ষুর সাথে সুপারিশকৃত অধিক লাভবান সাথীফসল প্যাকেজের ফলন ও আর্থিক সুবিধা

সাথীফসল প্যাকেজ	সমতুল্য ইক্ষুর ফলন (টন/হেক্টর)	নিয়ন্ত্রিত প্লটের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি (%)	নিয়ন্ত্রিত প্লটের তুলনায় আয় বৃদ্ধি (%)
রোপা আখ+টমেটো-মুগডাল	৩৫০.৪৫	২৫৭.৬০	২১৭.৫৭
রোপা আখ+বাঁধাকপি-মুগডাল	২১২.৬৭	১১৭.০০	১৬১.০০
রোপা আখ+রসুন-মুগডাল	১৬২.৮৮	৬৬.২১	১০৪.৬০
রোপা আখ+পেঁয়াজ-মুগডাল	১৬৩.৭৮	৬৭.১২	১০২.৭০
রোপা আখ+খেসারি-মুগডাল	১২৭.৫৬	৩০.১৫	৮৫.৩৫
রোপা আখ+মটরশুঁটি-মুগডাল	১৩০.০০	৩২.৬৬	৮৫.০৪
রোপা আখ+আলু-মুগডাল	১৬৩.২৩	৬৬.৫৫	৮৪.৯২
রোপা আখ+মসুর-মুগডাল	১২৩.৮৩	২৬.৩৫	৮১.৫৫
রোপা আখ+ছোলা-মুগডাল	১২৪.৬০	২৭.১৫	৮১.২১
শুধুমাত্র রোপা আখ (নিয়ন্ত্রিত)	৯৮.০০	-	-

চিত্র ২৫: আখের সাথে প্রথম সাথীফসল টমেটো

চিত্র ২৬: আখের সাথে প্রথম সাথীফসল বাঁধাকপি

চিত্র ২৭: আখের সাথে প্রথম সাথীফসল রশুন

চিত্র ২৮: আখের সাথে প্রথম সাথীফসল পেঁয়াজ

চিত্র ২৯: আখের সাথে দ্বিতীয় সাথীফসল মুগডাল

চিত্র ৩০: আখের সাথে তৃতীয় সাথীফসল কচু

উন্নত পদ্ধতিতে মুড়ি ইক্ষু চাষ ব্যবস্থাপনা: এ প্রযুক্তি প্যাকেজটি ২৫%-৩০% উচ্চ ফলন প্রদান করে এবং ০.৫-১.০ ইউনিট অধিক চিনি আহরণ নিশ্চিত করে। এর মধ্যে রয়েছে:

- উপযুক্ত জাত নির্বাচন
- গভীরভাবে ইক্ষু কর্তন
- সার ব্যবস্থাপনা
- স্টাবল সেভিং এবং ফাঁকাস্থান পূরণ
- রোগ ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি
- স্টাবল সেভিং করার পরপরই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা

চিত্র ৩১: মূল ইক্ষু মাঠ

চিত্র ৩২: মূল ইক্ষু কর্তনের পর মুড়ি

চিত্র ৩৩: প্রথম মুড়ি ইক্ষু

চিত্র ৩৪: দ্বিতীয় মুড়ি ইক্ষু

ইক্ষুর কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা ঃ জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতি, বীজ ইক্ষু নির্বাচন, রোপণের সময় ও পদ্ধতি, প্রতি ঝাড়ে উপযুক্ত সংখ্যক ইক্ষু, সেচ, আগাছা ব্যবস্থাপনা, কর্তন কৌশল ইত্যাদি।

ইক্ষুর সার ব্যবস্থাপনা: ১২ টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল এর জন্য ইক্ষু, সাথীফসল ও মুড়ি ইক্ষুর সারের মাত্রা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুপারিশ ও সময়োপযোগী করা হয়েছে।

ইক্ষুর রোগ ব্যবস্থাপনা: এ পর্যন্ত ইক্ষুর ৪০ টি ও ট্রপিক্যাল সুগারবিটের ১০ টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ইক্ষুর ১৩ টি পরজীবী কৃমি সনাক্ত এবং তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

- আখের লালপচা ও উইল্ট রোগের সংক্রমণ কমানো এবং মোজাইক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে রোগ প্রতিরোধী জাতের রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন ইক্ষু বীজ ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। সময়মত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনায় সুপারিশ করা হয়েছে।

- সাদা পাতা, মুড়ি খর্বা ও স্মাট রোগ দমনের জন্য MHAT মেশিনের সাহায্যে আর্দ্র-গরম বাতাসে শোধিত ইক্ষু বীজ ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

- সুগারবিটের স্কেলেরোসিয়াম রুট রট রোগ এবং রুট নট কৃমির প্রকোপ কমানোর জন্য হেক্টর প্রতি ২.৫ টন সরিষার খৈল জমিতে প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

- বীজপচা রোগ দমনের জন্য কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (অটোস্টিন, ব্যাভিস্টিন) এবং বিজলী ঘাস দমনের জন্য ইক্ষুর নালায় হেক্টর প্রতি ৩৯৫ কেজি ইউরিয়া এবং ২৪৭ কেজি পটাশ সার ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ এবং দুপুরে প্রখর রৌদ্রে বিজলী ঘাসের উপর ইউরিয়া দ্রবণ (১:২০ অনুপাতে) স্প্রে করার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ৩৫: লাল পচা রোগাক্রান্ত ইক্ষুর কান্ড

চিত্র ৩৬: ফাঁপা শুষ্ক কান্ড

চিত্র ৩৭: ফাঁপা শুষ্ক কান্ড রোগাক্রান্ত ইক্ষু ক্ষেত

চিত্র ৩৮: কালো শীষ রোগাক্রান্ত ইক্ষুর ঝাড়

চিত্র ৩৯: আনারস পচা গন্ধ রোগাক্রান্ত কান্ড

চিত্র ৪০: সাদা পাতা রোগাক্রান্ত ইক্ষুর ঝাড়

ইক্ষুর পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা: এ পর্যন্ত ইক্ষুর ৭০ টি পোকামাকড় সনাক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে ১০ টি বেশী ক্ষতিকারক। এছাড়াও সুগারবিটের ১০ টি পোকামাকড় সনাক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হচ্ছে সুগারবিট ক্যাটারপিলার। এছাড়া তাল খেজুরের রাইনোসেরাস বিটল, রেড পাম উইভিল, লিফ মাইনার, হোয়াইট ফ্লাই ইত্যাদি পোকামাকড় সনাক্ত করা হয়েছে। মৌমাছির ক্ষেত্রে আফ্রিকান জায়ান্ট হর্ণ, বাম্বেল মাছি, মোম বিটল পোকা এবং ভারোয়া মাইট সনাক্ত করা হয়েছে। এ সকল পোকামাকড়ের দমন ব্যবস্থা নিম্নরুপ:

- কালচারাল ও যান্ত্রিক উপায়ে সকল ক্ষতিকারক পোকার দমন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- জৈবিক উপায়ে ইক্ষুর মাজরা পোকা, ডগার মাজরা পোকা এবং পাইরিলা দমন।
- রাসায়নিক বালাইনাশকের সাহায্যে আগাম মাজরা পোকা, ডগার মাজরা পোকা, আখের কান্ডের মাজরা পোকা, উঁইপোকা, শিকড়ের মাজরা পোকা এবং পাইরিলা দমন।
- ফেরোমেন ট্রাপ ও রাসায়নিক কীটনাশকের সাহায্য সুগারবিট ক্যাটারপিলার পোকা দমন।
- খেজুর গাছের রেড পাম উইভিল দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- মৌমাছির ভারোয়া মাইট দমনে সুগার ডাস্ট ব্যবহার, মোম বিটল পোকা দমনে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং টপবার ব্যবহার, জায়ান্ট হর্ণ দমনে ট্রাপ ব্যবহার করার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ৪১: ট্রাইকোগ্রামা ডিম্ব পরজীবী দ্বারা কান্ডের মাজরা পোকার জৈবিক দমন

চিত্র ৪২: ডগার মাজরা পোকার যান্ত্রিক দমন

চিত্র ৪৩: টানা জালের সাহায্যে ইক্ষুর পাইরিলা দমন

চিত্র ৪৪: গোড়ার মাজরা পোকার মথ ও লার্ভা

খামার যান্ত্রিকীকরণ:

১৯৮৯ সাল থেকে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি প্রকৌশল বিভাগের কর্যক্রম শুরু হয়। যা দেশের ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপ উৎপাদন খাতে উন্নত কৃষি প্রকৌশল প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ যাবৎ বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৩৩ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে এর মধ্যে :

ক) কৃষি যন্ত্রপাতি ও পোষ্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ১৬ টি
খ) নবায়নযোগ্য শক্তি বিষয়ে ৭ টি এবং
গ) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৯ টি

- ইক্ষুচাষের জন্য বিএসআরআই ইক্ষু মাড়াই যন্ত্র এবং জোড়া-সারি ট্রেঞ্চারসহ বেশ কিছু সংখ্যক কৃষি যন্ত্রপাতি ও খামার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে।

চিত্র ৪৫: সুগারকেন জুসার

চিত্র ৪৬: উইডার মেশিন

চিত্র ৪৭: বিএসআরআই পাওয়ার ক্রাশার

চিত্র ৪৮: বিএসআরআই বেডফরমার কাম ট্রেঞ্চার

কৃষি অর্থনীতি বিভাগ প্রযুক্তি উদ্ভাবন কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। তবে বিএসআরআই এর বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ হতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের ব্যয় সাশ্রয় পদ্ধতি ও ভায়াবিলিটি যাচাই-বাছাই করে থাকে। এছাড়াও কৃষকের মাঠে প্রযুক্তি সমূহের যথার্থতা যাচাই করে।

জাতীয় অর্থনীতিতে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবদানঃ

অদ্যাবধি বিএসআরআই হতে ৪৮ টি ইক্ষু জাত, ইক্ষুর সাথে সাথী ফসলের আবাদ, রাসায়নিক কীটনাশক এবং উপকারী জৈবিক এজেন্ট ব্যবহার করে পোকামাকড় ও রোগ দমন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অনুমোদিত মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ, উন্নতমানের পাওয়ার ক্রাশার ব্যবহার করে অধিক গুড় উৎপাদন ইত্যাদি প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে এসব প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং নতুন প্রযুক্তিগুলো মাঠ পর্যায়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে জিওবি (GOB) এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ব্যয় সাশ্রয় ও ভায়াবিলিটি যাচাই-বাছাই করে বিএসআরআই এর প্রযুক্তিসমূহের বিনিয়োগ অবদান ১৬% (IRR ১৬%)। অর্থাৎ ইক্ষু গবেষণায় ১০০ টাকা বিনিয়োগ করলে বার্ষিক ১৬ টাকা হারে লাভ পাওয়া যায়।

কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে জানা যায় জাতীয় অর্থনীতির বার্ষিক জিডিপিতে ইক্ষুর অবদান ০.৭৯%। প্রতি বছর ইক্ষুর জিডিপিতে অবদান টাকার অংকে গড়ে ৩৫০০-৪৫০০ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ সালে দেশে ২২.৭২ লক্ষ টন ইক্ষু উৎপাদিত হয় যা বার্ষিক জিডিপিতে মূল্য সংযোজিত হয়ে স্থির বাজার মূল্যে জিডিপি আয় ৩৮১১.৮৩ কোটিতে দাঁড়ায়। এর মধ্যে গুড় হতে ২২৮৬.০০ (০.০৭%) কোটি, চিনি হতে ২৬.৪২ (০.০১%) কোটি, ইক্ষুবীজ হতে ৭২.৫০ (০.০০%) কোটি, পশু খাদ্য ও জ্বালানী হতে ১০২.৩৬ (০.০০%) কোটি, বাই-প্রডাক্ট হতে ৫৪১.১০ (০.০২%) কোটি এবং চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু ও রস হতে ৫৪৩.৪০ (০.০২%) কোটি টাকা পাওয়া যায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, মিলজোন এলাকায় শতকরা ৯৯ ভাগ জমিতে বিএসআরআই উদ্ভাবিত জাতসমূহ চাষাবাদ হয়ে থাকে। বাকী ১% চাষবাদ হয় স্থানীয় জাত এবং কোন কোন জায়গায় কিছু ক্লোন চাষাবাদ হয়। কৃষকের মাঠের এবং গবেষণার মধ্যে ফলন পার্থক্য অনেক বেশী (২০-৪০ টন/হে.)। এর কারণ খুঁজে দেখা যায়, জমির ধরণানুযায়ী সঠিক জাত নির্বাচন না করা, রোগমুক্ত বিশুদ্ধ বীজের অভাব, সঠিক সময়ে নিড়ানী ও সেচ প্রদান না করা, উপযুক্ত সময়ে সঠিক মাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করা, মোটকথা সঠিক কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার অভাবে ইক্ষুর ফলন কমে যাচ্ছে। এছাড়াও মিলজোন এলাকায় অন্য ফসলের তুলনায় দাম কম পাওয়ার জন্য কৃষকেরা ইক্ষু চাষে অনাগ্রহী। কিন্তু রস ও চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষুতে কৃষকেরা অনেক বেশী লাভবান হয় বিধায় ননমিল জোন এলাকা বিশেষ করে পাহাড়ী এলাকায় এর ফলন অনেক বেশী। এক বিঘা জমি থেকে প্রায় ১.০-১.৫ লক্ষ টাকা লাভ হচ্ছে। যা অন্য কোন ফসল থেকে সম্ভব নয়।

সম্মাননা ও পুরস্কারঃ

প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে দু'টি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ১৯৯১ সালে কাজী মাহবুবউল্লাহ জেবুন্নেছা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে 'রোপা ইক্ষুচাষ প্রযুক্তি' উদ্ভাবনের জন্য একটি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এছাড়া বিএসআরআই এর কীটতত্ত্ব বিভাগকে জৈবিক উপায়ে ইক্ষুর কান্ডের মাজরা পোকা দমন গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ প্রাণীবিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক

১৯৯৭ সালে 'ড. মোস্তাফিজুর রহমান স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠান চরাঞ্চলে ইক্ষু চাষ বিস্তার শীর্ষক কাজে অবদানের জন্য জাতীয় কৃষি রৌপ্য পদক অর্জন করে।

এসব ছাড়াও প্রতি বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত জেলা পর্যায়ের কৃষি মেলায় প্রযুক্তি প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করে এ ইনস্টিটিউট উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'শ্রেষ্ঠ ষ্টল' পুরস্কার লাভ করেছে। তাছাড়া বেশকিছু বিজ্ঞানী তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে দেশে ও বিদেশে প্রশংসার/সম্মাননার সনদপত্র/প্লাক/ক্রেস্ট অর্জন করেছেন।

গবেষণার নতুন কৌশলঃ

চিনি ও গুড় শিল্পের উত্তরোত্তোর চাহিদার প্রেক্ষিতে বিএসআরআই ইতোমধ্যেই তার গবেষণা কৌশল পরিমার্জন করেছে। প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, গবেষণার নতুন এ কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইক্ষুচাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের চিনি ও গুড় শিল্পের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। নতুন গবেষণা কৌশলগুলি নিম্নরুপঃ

বায়োটেকনোলজি ভিত্তিক ইক্ষু উন্নয়নঃ

- উচ্চ ফলনশীল, উচ্চ চিনিসমৃদ্ধ, দ্রুত বর্ধনশীল, লবণাক্ততা সহিষ্ণু, পরিপক্ক পাতা ঝরে পড়া ও আখ নেতিয়ে না পড়ার গুণসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে ঐ বিশেষ ধরণের ইক্ষুজাত উদ্ভাবন করা।
- রোগ প্রতিরোধী ট্রেইটস বা উপকরণ সমূহকে ডিএনএ পুনর্গঠন প্রযুক্তির মাধ্যমে (এ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম এর মাধ্যমে স্থানান্তর) ইস্পিত জাতে প্রতিস্থাপন করা।
- উন্নত ইক্ষুজাতসমূহের মাইক্রোপ্রোপাগেশন এর মাধ্যমে দ্রুত বীজ বর্ধন।
- জীব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা।
- টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে ইক্ষুর রোগমুক্ত বিশুদ্ধ চারা উৎপাদন করা।

চিত্র ৪৯: কৃত্রিম মাধ্যমে ইক্ষুর এক্সপ্লান্ট স্থাপন

চিত্র ৫০: কৃত্রিম মাধ্যমে ইক্ষুর গজানো কুঁশি

চিত্র ৫১: কৃত্রিম মাধ্যমে স্টেভিয়ার ক্যালাস

চিত্র ৫২: কৃত্রিম মাধ্যমে স্টেভিয়ার ক্যালাসে গজানো কুঁশি

চিত্র ৫৩: কৃত্রিম মাধ্যমে সুগারবিটের ক্যালাস

চিত্র ৫৪: কৃত্রিম মাধ্যমে সুগারবিটের গজানো কুঁশি

চিত্র ৫৫: কৃত্রিম মাধ্যমে আরবীয় খেজুরের ক্যালাস

চিত্র ৫৬: কৃত্রিম মাধ্যমে আরবীয় খেজুরের গজানো কুঁশি

চিত্র ৫৭: কৃত্রিম মাধ্যমে তালের এক্সপ্লান্ট স্থাপন

চিত্র ৫৮: কৃত্রিম মাধ্যমে তালের গজানো কুঁশি

- ❖ ইক্ষুর জৈবিক নাইট্রোজেন অনুবন্ধের উপর গবেষণা। বিএসআরআই অবমুক্ত ইক্ষুজাতের মধ্যে নাইট্রোজেন ফিক্সেশনের ক্ষমতা থাকায় এ ধরণের ইক্ষুজাত আবাদের জন্য ইউরিয়া সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে (>৬০%) হ্রাস পাবে।
- ❖ আবাদি জমির স্বল্পতাহেতু নিবিড় সাথীফসলসহ চিরন্তনী পদ্ধতিতে ইক্ষু আবাদের ‘কৃষিতাত্ত্বিক প্যাকেজ’ উদ্ভাবন। সীমিত জমিতে বছরের পর বছর ইক্ষু ও সাথীফসল আবাদের জন্য লাগসই পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ প্রধান প্রধান কীটপতঙ্গগুলিকে (আগাম মাজরা পোকা, ডগার মাজরা পোকা, গোড়ার মাজরা পোকা, কান্ডের মাজরা পোকা, সাদা কীড়া ও পাইরিলা) জৈবিক উপায়ে দমনের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা। কার্যকর জৈবিক পদ্ধতিতে পোকা দমনের এজেন্ট (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) সনাক্ত করা। অনুবন্ধের সন্ধান করা তেমনই একটি এজেন্ট *Trichogramma* sp. এর অবমুক্তির সময় ও মাত্রা সম্পর্কিত কৌশল নিরূপণ।

- সম্প্রতি খেজুর গাছের ক্ষতিকর লাল উইভিল পোকা দমনের মাধ্যমে খেজুর গাছের, রসের ও খেজুরের অভূত রোপণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে।
- মৌমাছির পোকামাকড় ও মাইট দমন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে মৌমাছির স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- ইক্ষুর প্রধান প্রধান রোগ সৃষ্ঠিকারী প্যাথোজেনসমূহের শত্রু অনুউদ্ভিদ (Microflora) সমূহ সনাক্তকরণ। ডিএনএ (DNA) ভিত্তিক প্রটোকল প্রয়োগের মাধ্যমে ইক্ষুর রোগসমূহের তালিকা (Indexing) প্রণয়ন।
- গুড় উৎপাদনের জন্য পরিষ্কারক হিসেবে উদ্ভিজ্জ সংশ্লেষ এর ব্যবহার। সুবিধাজনক উদ্ভিজ্জ পরিষ্কারক বাছাই করে তার উন্নয়ন।
- ইক্ষুর ছোবড়াসহ অন্যান্য বাই-প্রডাক্টের ব্যবহার বহুমুখীকরণ।
- গুড় উৎপাদন ও চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী আরো উন্নতমানের ইক্ষুজাত উদ্ভাবন করা।
- অধিক ফলন ও অধিক চিনি আহরণের জন্য মুড়ি ইক্ষু ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি প্যাকেজের উন্নয়ন করা।
- চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ফলিত গবেষণা, সরেজমিন গবেষণা, খামার যান্ত্রিকীকরণ বিন্যাস গবেষণা এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ গবেষণায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা।
- বিএসআরআই এর ম্যান্ডেট অনুযায়ী ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, মধু, স্টেভিয়া, গোলপাতাসহ অন্যান্য অপ্রচলিত মিষ্টিজাতীয় ফসলের উপর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

চিত্র ৫৯: মৌমাছি ও মধু

চিত্র ৬০: গোলপাতা

চিত্র ৬১: খেজুর

চিত্র ৬২: স্টেভিয়া

চিত্র ৬৩: তাল

চিত্র ৬৪: সুগারবিট

মৌমাছি ও মধু বিষয়ক গবেষণায় অগ্রগতি:

মধু মিষ্টি জাতীয় খাদ্য হওয়ায় মানুষের মস্তিস্ক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মধু উৎপাদনে ১ শতাংশও বাড়তি জমির প্রয়োজন হয় না। সরিষার ফুল, কালোজিরা, ধনিয়ার ফুল, লিচুর ফুল বিশেষ করে সুন্দরবনের বিভিন্ন ফুল থেকে মধু উৎপাদিত হয়। ২০২০ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মধু ও মৌচাষ গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে মৌমাছি ও মধু বিষয়ক গবেষণা কাজ শুরু করা হয়। ২০২০-২০২৩ সাল পর্যন্ত কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয় এবং গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বেগবান রয়েছে। উক্ত কর্মসূচির অর্থায়নে মধু ও মৌমাছি গবেষণা ভবন কীটতত্ত্ব বিভাগের সাথে সংযুক্ত করে স্থাপন করা হয়। গবেষণা জোরদারকরণ ও মৌখামারীদের মাঝে বিতরণের জন্য বিদেশ থেকে উন্নত মানের মৌ উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়। বিএসআরআই খামারে রুফটপ এ্যাপিয়ারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমগ্র বিএসআরআই এলাকাতে মৌমাছির খাবারে সুবিধা হয় এমন পোলেন ও নেকটার সমৃদ্ধ গাছ রোপণ করা হয়। যার মধ্যে সজিনা, লেবু, বড়ই অন্যতম। একটি লেককে সংস্কার করে শাপলা ও পদ্ম লাগানো হয়েছে যার ফলে একদিকে দৃষ্টিনন্দন ও মৌমাছির খাদ্য পোলেনের উৎস হিসেবে কাজ করছে। এই কর্মসূচির আওতায় বিদেশী মৌবক্স এর অনুরুপ দেশিয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিএসআরআই কাঠের মৌবক্স তৈরী করেছে। যা পরীক্ষামূলকভাবে অত্যন্ত সফল হয়েছে এবং মৌ খামারীদের মাঝে ব্যাপক সারা পড়েছে। মৌমাছির স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়েও গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। মৌমাছির পোকামাকড় ব্যবস্থাপনার আওতায় মৌমাছির মোম বিটল পোকা, ভারোয়া মাইট এবং গ্যালেরিয়া পোকার দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা, ক্রান্তিকালে মৌমাছির খাবার ব্যবস্থাপনা, রানীর বৈচিত্রতা পর্যবেক্ষণ, পোলেন সংগ্রহ পদ্ধতি উন্নয়ন গবেষণা অব্যাহত আছে দেশের বিভিন্ন মৌখামারে। এছাড়াও কর্মসূচির মাধ্যমে মধু প্রোসেস মেশিন, অটোমেটিক ফাউন্ডেশন সীট তৈরীর মেশিন, ইনসেমিনেশন মেশিন স্থাপন করা হয়েছে বিএসআরআই এর মৌমাছি ও মধু গবেষণা ভবনে। অটোমেটিক ফাউন্ডেশন সীট মেশিনটি মৌখামারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরী করেছে। কারণ এটি বাংলাদেশের একমাত্র অটোমেটিক ফাউন্ডেশন সীট মেশিন, যার দ্বারা উন্নত মানের মোমের সীট মৌখামারীদের সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও ১১০০ জন মৌখামারীকে মৌচাষ কার্যক্রম ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল, মধু ও উপজাত উৎপাদন, মৌ উপকরণের বাস্তব ভিত্তিক ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

গোলপাতা বিষয়ক গবেষণায় অগ্রগতি:

জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে তাল, খেজুর ও গোলপাতা উন্নয়নের জন্য পাইলট প্রকল্প ৯৮২.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিএসআরআই এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। যার অর্থায়নে ২০,০০০ গোলপাতার চারা পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় রোপিত হয়েছে এবং প্রায় ৩০০ গোলপাতা চাষীকে বিএসআরআই উদ্ভাবিত আধুনিক চুলায় গোলপাতার গুড় জ্বাল, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গোলপাতার রস সংগ্রহ, গুড় তৈরী ও বিপণন প্যাকেজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার খোনকার বেড় নামক গ্রামে পূর্বে গুড় আহরিত হয়নি এমন গোলপাতার বাগানে গোলপাতার গুড় উৎপাদন প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো হয়েছে। পরবর্তীতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০১৫ সাল হতে প্রতিবছর

কৃষক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে একেবারে স্বল্প খরচে প্রায় ২০,০০০ গোলপাতার চারা পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা এবং বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলায় রোপিত হয়েছে। বর্তমানে বিএসআরআই এর কাছে গোলপাতার চারা তৈরী বিষয়ক একটি এবং সাধারণ ও দানাদার গুড় তৈরী বিষয়ক দুইটি মোট তিনটি সম্প্রসারণযোগ্য প্রযুক্তি রয়েছে। যা সম্প্রসারণ করে লবণাক্ত এলাকায় খালপাড়, নদীর ধার কিংবা বাঁধের পাশে রোপিত গোলপাতা গাছ মাটির ক্ষয় রোধে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালন করে। পরিবেশবান্ধব গোলপাতার গাছ হতে রস আহরণের সময় তাল, খেজুর বা নারিকেল গাছের মত গাছের উপরে উঠার প্রয়োজন হয়না তাই এটি নারীবান্ধব। পরিবারের ছোট থেকে বড়, বয়োবৃদ্ধ নারী ও পুরুষ সবাই গুড় তৈরীতে অবদান রাখতে পারে। এছাড়া গোলপাতার মরা ডাল, পাতা থেকে জ্বালানী পাওয়া যায়। তাই গোলপাতা হতে গুড় তৈরী যেমন সহজ তেমনি জ্বালানী ও শ্রমিক খরচ কম হওয়ায় লাভ বেশি।

খেজুর বিষয়ক গবেষণায় অগ্রগতি:

বিএসআরআই ২০১০ সালে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে খেজুর বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন কলা-কৌশল নিয়ে কাজ শুরু করে এবং ২০১৯ সালের পর হতে এ বিষয়ক গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বেগবান হয়। এ যাবৎ বিএসআরআই 'তাল, খেজুর ও গোলপাতা উন্নয়নের জন্য পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নে তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও নয়টি উপকেন্দ্রের সহায়তায় প্রায় ১ লক্ষ খেজুর চারা সারাদেশে বিতরণ এবং ১০০০ জন খেজুর চাষীকে উন্নত পদ্ধতিতে খেজুর গাছ হতে রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিএসআরআই এর খেজুর বিষয়ক মোট সাতটি লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- পলিব্যাগে খেজুরের চারা তৈরী; খেজুর গাছ হতে অধিক রস আহরণের জন্য পরিচর্যা প্যাকেজ; খেজুর গাছ হতে গাছের স্বাস্থ্য রক্ষা করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিরাপদ রস আহরণ প্রযুক্তি; নিপা ভাইরাসমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ রস সংগ্রহের জন্য নেটিং প্রযুক্তি; স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ গুড় উৎপাদনের জন্য উন্নত চুলা তৈরী; খেজুরের রস হতে দানাদার, ব্লক, বিভিন্ন রকমের পাটালি গুড় এবং সিরাপ উৎপাদন প্রযুক্তি এবং খেজুরের গুড় সংরক্ষণ প্রযুক্তি।

নারিকেল বিষয়ক গবেষণায় অগ্রগতি:

পৃথিবীতে বসবাসরত সকল মানবজাতির দৈহিক শক্তি, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং বিকাশের জন্য প্রতি মুহূর্তে গ্লুকোজের প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের জন্য চিনি বা গুড়ের চাহিদা বছরে প্রায় ২২ লক্ষ টন। বর্তমানে আখ থেকে উৎপাদিত চিনি এবং আখ, খেজুর, তাল ও গোলপাতা থেকে উৎপাদিত গুড় সব মিলিয়ে বছরে প্রায় ৫.৫০ লক্ষ টন অর্থাৎ প্রতিবছর প্রায় ১৬.৫০ লক্ষ টন ঘাটতি থেকে যায়। এই ঘাটতি পূরণে প্রতিবছর প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকার অপরিশোধিত চিনি আমদানি করতে হয়। সে হিসেবে আখ, তাল, খেজুর ও গোলপাতা থেকে উৎপাদিত চিনি বা গুড়ের পাশাপাশি নারিকেল গুড় বা চিনি হতে পারে অন্যতম একটি উৎস।

নারিকেলের বৈজ্ঞানিক নাম: *Cocos nucifera*। দেশের প্রায় সব জায়গাতেই নারিকেল গাছ জন্মে। তবে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে বেশি নারিকেল উৎপাদিত হয়। উপকূলীয় দ্বীপ সেন্টমার্টিনে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠেছে বিশাল নারিকেল বাগান। যে কারণে

দ্বীপটির স্থানীয় জনপ্রিয় নাম হলো নারিকেল জিঞ্জিরা। উর্বর জমিতে একটি লম্বা নারিকেল গাছ হতে প্রতি বছরে প্রায় ৩০-৭৫টি নারিকেল পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে উন্নত জাতে এ সংখ্যা আরো বেশি দেখা যায়। যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যা দেয়া হলে একটি নারিকেল গাছ ছয় থেকে দশ বছরের মধ্যে প্রথম ফল উৎপাদন করে। প্রচুর সূর্যের আলো, বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১,৫০০-২২,৫০০ মিমি, আর্দ্রতা (৭০-৮০)% এবং বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নারিকেল চাষের জন্য উত্তম।

FAO এবং ইন্টারনেটের তথ্য অনুযায়ী শুধু ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং ইন্ডিয়াতেই বিশ্বের প্রায় ৭৫% নারিকেল উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ২০২২-২৩ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ২২৪০৩.৫১ হে. জমিতে নারিকেল চাষ করা হয় এবং সেখান থেকে উৎপাদিত হয় মোট ৪৫৭০৮৮.২১ মে. টন ডাব/নারিকেল। প্রথম আলোর তথ্য মতে শ্রীলংকায় বছরে মাথাপিছু নারিকেলের ব্যবহার ১৪০ টি। আর বাংলাদেশে একজন মানুষ বছরে মাত্র ১ টি নারিকেল ব্যবহার করে। এই হিসেবেও বছরে আমাদের প্রায় ১৭ কোটি নারিকেল প্রয়োজন। এক সময় নারিকেল গাছ থেকে শুধু ডাব ও নারিকেলের জন্য চাষ করা হতো কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশে এটি এখন চিনি উৎপাদনকারী ফসল হিসেবেও পরিচিত। বিশেষ করে থাইল্যান্ড ও ভারতে নারিকেল ফুলের পুষ্পমঞ্জুরী থেকে প্রাপ্ত রস হতে নারিকেল গুড়, চিনি, সিরাপ, নিরা ড্রিংকস এমনকি নিরা মধুও তৈরী হচ্ছে যা বিশ্বের অনেক দেশেই ব্যাপক পরিচিত ও চাহিদা সম্পন্ন।

নারিকেল গাছের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। চিনি, গুড় তৈরী ছাড়াও নারিকেল দুধ, নারিকেল তেল সহ বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রীতে ব্যবহার হয়। বিশ্বের অনেক দেশেই এখন নারিকেল চিনি উৎপাদনকারী ফসল হিসেবে পরিচিত হওয়ায় নারিকেল গাছ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা করার জন্য রয়েছে অপার সম্ভাবনা। দেশের মোট উৎপাদনের ৪০ শতাংশ নারিকেল ডাব হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ৪৫ শতাংশ ঝুনা নারিকেল হিসেবে খাওয়া হয়, ৯ শতাংশ দিয়ে তেল তৈরী হয় এবং অবশিষ্ট ৬ শতাংশ থেকে চারা তৈরী করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে নারিকেলের জাত উদ্ভাবন করেছে। বারি নারিকেল-১ যা মধ্যম আকৃতির এবং সারা বছর ফল ধরে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) খর্বাকৃতির ওপি জাতের নারিকেল চারা রোপণের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীদের ডাবের পানির চাহিদা দিনদিন বেড়েই চলেছে। নারিকেল গুড়ের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম হওয়ায় তা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী হয়ে থাকে। নারিকেল থেকে উৎপাদিত গুড় বা চিনি অনেক সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হওয়ায় এর বাজার মূল্য ভালো। নারিকেলের ছোবড়া থেকে তৈরী কোকোপিটে ১০০% জৈব উপাদান থাকায় এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় তা ব্যাপকভাবে বীজ থেকে চারা তৈরী, ছাদবাগানে এবং হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তাল বিষয়ক গবেষণায় অগ্রগতি:

১৯৯৭ সালে বিএসআরআই প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত তালের বাগানে নিয়মিত তাল বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে

বিএসআরআই তাল ১ নামে বারমাসি তালের জাত নিবন্ধন করা হয়। জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে তাল, খেজুর ও গোলপাতা উন্নয়নের জন্য পাইলট প্রকল্প শীর্ষক একটি প্রকল্প ৯৮২.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিএসআরআই এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। যার অর্থায়নে প্রায় ১ লক্ষ তালের চারা দেশব্যাপী রোপিত হয়েছে এবং ১০০০ তাল চাষীকে বিএসআরআই নির্মিত আধুনিক চুলায় তালের গুড় জ্বাল, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তালের রস সংগ্রহ, গুড় তৈরী ও বিপণন প্যাকেজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ হতে ২০২৩ মেয়াদে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উন্নত মানের তালের চারা উৎপাদন ও বিতরণ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ৬৫০০০ তালের চারা রোপিত হয়েছে এবং ৫০০ জন তাল চাষীকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তালের চারা উত্তোলন, তালের আঁশ ব্যবহার করে সৌখিন পণ্য তৈরী; আধুনিক পদ্ধতিতে তালের গুড় ও তালমিছরি উৎপাদন এবং বজ্রপাত হতে বাঁচতে করণীয় বিষয়ক নিবীড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসআরআই এর কাছে তালের চারা তৈরী বিষয়ক দুইটি, সাধারণ ও দানাদার গুড় তৈরী বিষয়ক দুইটি এবং তালমিছরি উৎপাদন বিষয়ক একটি মোট পাঁচটি সম্প্রসারণযোগ্য প্রযুক্তি রয়েছে। তাল এমন একটি ফসল যার কোন অংশ ফেলনা নয়। তাল থেকে আমরা রস ও গুড় পাই। তালশ্বাস (তালকুর) ও পাকা তাল বাজারে বিক্রি হয়। তালের পিঠা বড়ই মজাদার। তাল মিছরি বিভিন্ন অসুখে ভীষণ উপকারী এছাড়া খেতেও সুস্বাদু। এর পাতা দিয়ে বিভিন্ন রকমের হাত পাখা তৈরী হয়। তালের কাঠ অত্যন্ত শক্ত এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। তাল গাছের কোন প্রকার পরিচর্যার দরকার পড়ে না তথা কোন অতিরিক্ত খরচও নেই। এছাড়া এর শক্ত আঁশ দিয়ে অনেক প্রকার সৌখিন দ্রব্যাদি তৈরী করা হয়। গ্রিন বেল্ট ও শেল্টার বেল্টের জন্য সবচেয়ে উপযোগী উদ্ভিদের মধ্যে তাল অন্যতম। পরিকল্পিতভাবে লাগানো তালগাছ যেকোন স্থানের সৌন্দর্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাল রস শীতল, বলকারক, শ্রমহর, উত্তেজক ও মূত্রকর। পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয় ও ইনটেস্টাইনের রোগে বিশেষ উপকারী। তাল মিছরি কাশির উপশম করে। গনোরিয়া, শ্বেত প্রদর, অনিদ্রা, ক্লান্তি, রক্তপ্রদাহ, অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের ঔষধ তাল থেকে তৈরী হয়। তালের রস ও গুড়ের স্বাস্থ্যগত গুরুত্ব বেশ উল্লেখযোগ্য, কারণ এটি প্রাকৃতিকভাবে কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (৩৫) বিশিষ্ট, যা রক্তে শর্করার মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়াতে সাহায্য করে। এতে ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ থাকে, যা হাড়ের গঠন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তালের গুড়ে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড ও ফেনোলিক যৌগ শরীরের কোষগুলোর অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এতে থাকা প্রাকৃতিক ফাইবার হজমক্রিয়া উন্নত করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে সাহায্য করে। তালের রসে প্রচুর পরিমাণে পানি এবং ইলেকট্রোলাইটস (পটাশিয়াম, সোডিয়াম) থাকে, যা শরীরে পানির ভারসাম্য রক্ষা করে। রসের প্রাকৃতিক এনজাইম হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। তালের বিভিন্ন পণ্যের দেশে ও বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই এর চাষাবাদ লাভজনক।

আঙ্গুর বিষয়ক গবেষণায় অগ্রগতি:

আঙ্গুর (*Vitis vinifera*) একটি বেরি জাতীয় ফল। এ ফলটির উৎপত্তি মধ্য এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। পারস্য (ইরান) হতে ভারতীয় উপমহাদেশে আঙ্গুর চাষের প্রচলন শুরু হয়েছিল। উষ্ণ, শুষ্ক আবহাওয়া আঙ্গুর চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আঙ্গুর চাষের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা হলো ২৫^{0} সেলসিয়াস হতে ৩৫^{0} সেলসিয়াস, তবে শীতকালে সুপ্তাবস্থার জন্য

ঠান্ডা এবং সুপ্তাবস্থা ভাঙ্গার পর ফল ধরা ও ফল পাকার জন্য উষ্ণ আবহাওয়া ও রৌদ্রোজ্জ্বল দিন প্রয়োজন। উচ্চ আর্দ্রতা এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ছত্রাক জনিত রোগের প্রকোপ বাড়ায় এবং ফল ফেটে যায়। আঙ্গুর ফল একদিকে যেমন সরাসরি কাচা খাওয়া যায় কিংবা শুকিয়ে সংরক্ষণ করে খাওয়া যায়। অপরদিকে আঙ্গুর হতে জুস, জ্যাম বা ভিনেগার তৈরী করা যায়।

এনবিআর এর তথ্য অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার টন আঙ্গুর আমদানি হয়েছে। এ পরিমাণ আঙ্গুর আমদানি বাবদ প্রায় ৩,২৩৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আমদানি শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য করের কারণে বিদেশী ফলের দাম অনেক বেড়ে যায় এবং সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে যায়।

সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষত যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, নাটোর, নওগাঁ প্রভৃতি জেলায় আঙ্গুর চাষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিছু তরুণ উদ্যোক্তা আঙ্গুর চাষে সাফল্য পাচ্ছেন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ সকল উদ্যোক্তাদের সফলতার খবর প্রচারিত হওয়ায় উদ্যোক্তা ও চাষীদের মাঝে আঙ্গুর চাষে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। যে সকল জাত চাষে সফলতা আসছে তাদের মধ্যে বাইকুনুর, একেলো, গ্রীন লং এবং ব্ল্যাকম্যাজিক উল্লেখযোগ্য। এ জাতগুলো ইউক্রেন হতে এসেছে। এ ছাড়া ভারত, চীন, জাপান, জর্ডান প্রভৃতি দেশ হতে মানিকচমন, সুপারসনাকা, সুলতানা, ক্রিমসন, জেসমিন, চাইনিজ রেড রোজ, সুপার রেডহানি, কুইননিনা, রেডফুজি, নাডু সীডলেস এবং আরও অনেক জাত এ দেশে এসেছে যেগুলো ছাদ বাগানে এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে চাষাবাদ পর্যায়ে আছে। এ সকল জাতের চারা উচ্চমূল্যে ক্রয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাগান করা হচ্ছে লাভের আশায়। কিন্তু এ সব জাতের মধ্যে কোন কোনটি বা কয়টি জাত ভালো ফলন দিবে, কত বছর ফলন দিবে, এ সকল জাতের চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা কি হবে সে বিষয়ে কোন গবেষণা কিংবা গবেষণা ফলাফল নেই।

প্রজনন বিভাগ, বিএসআরআই ২০২৫ সালে ইউক্রেন, জর্ডান, চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশের আঙ্গুরের ৩০ টি জার্মপ্লাজম নিয়ে গবেষণা কাজ শুরু করেছে। এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো- জার্মপ্লাজমগুলোর অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য স্টাডি করা এবং পরবর্তীতে সম্ভাবনাময় জার্মপ্লাজমের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী জাত উদ্ভাবন করা। জাত উদ্ভাবনে সফলতা আসলে কৃষকদের মাঝে চারা বিতরণ ও বাগান তৈরির মাধ্যমে দেশে আঙ্গুরের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আমদানি হ্রাস করা।

চিত্র ৬৫ : আঙ্গুর গবেষণা মাঠ

website: www.bsri.gov.bd